হেলেন কেলার এর

দ্য স্টোরি অব মাই লাইফ

রূপান্তর : হাসান মেহেদী

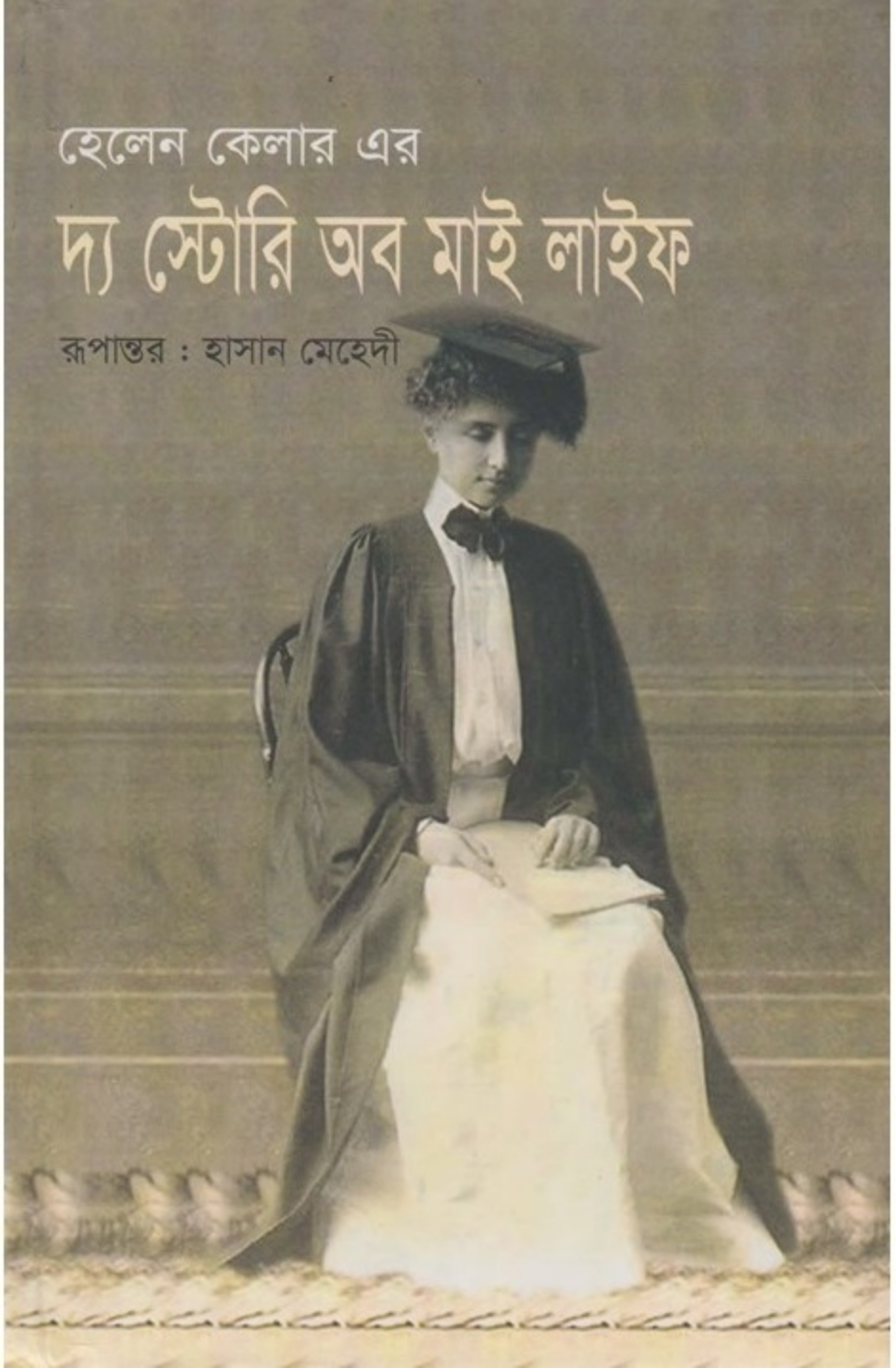

হেলেন কেলার এর আত্মজৈবনিক রচনা 'দ্য স্টোরি অব মাই লাইফ' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৩ সালে। তখন তার বয়স মাত্র তেইশ। বইটি প্রকাশের পরপরই পাঠকমহলে ব্যাপক সাড়া জাগায়। তিনি পৌঁছে যান জনপ্রিয়তার তুঙ্গে।

হেলেন কেলার কীভাবে তাঁর অসম্ভব জীবনকে সম্ভাবনার দোরগোড়ায় নিয়ে গেছেন তারই চমৎকার বর্ণনা রয়েছে এই গ্রন্থে। তাঁর লেখনীশক্তি, বাক্যে শব্দের গাঁথুনি ও নান্দনিকতার প্রয়োগ– গ্রন্থটিকে একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের মর্যাদা দিয়েছে নিঃসন্দেহে।

ইংরেজি থেকে 'দ্য স্টোরি অব মাই লাইফ' বাংলা রূপান্তরে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। যাতে হেলেনের বলার বাচনভঙ্গী ও বর্ণনা থেকে কোনোপ্রকার বিচ্যুতি না ঘটে।

আশা করি বইটি সকল শ্রেণীর পাঠককে আকৃষ্ট করবে।

প্রচ্ছদ : গুলশান কবীর

হেলেন কেলার এর
দ্য স্টোরি অব মাই লাইফ

রূপান্তর : হাসান মেহেদী

বর্ণের পর বর্ণ গাঁথি, সাজাই শব্দ স্বপ্ন দিয়ে
বাংলাপ্রকাশ
www.banglaprakash.com

www.amarboi.org

তৃতীয় মুদ্রণ
এপ্রিল ২০১৩, বৈশাখ ১৪২০

দ্বিতীয় মুদ্রণ
মে ২০১০, বৈশাখ ১৪১৭

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ২০০৮, শ্রাবণ ১৪১৫

প্রকাশক
প্রকৌ. মো. মেহেদী হাসান

বাংলাপ্রকাশ
৩৮/২-খ তাজমহল মার্কেট, নিচতলা
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৯৫১৪৫৬৮, ৭১২০৪০৩
E-mail : info@banglaprakash.com

পরিবেশক
লেকচার পাবলিকেশন্স লি., ঢাকা
[ISO 9001 : 2008 Certified Books Distributor]

বিদেশে পরিবেশক
অরিয়ল, ১৪ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
ত্রিপুরা বাণী প্রকাশনী, শকুন্তলা রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা
রূপসী বাংলা, ২২০ টুটিং হাই স্ট্রিট, লন্ডন
সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন
মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক, আমেরিকা

স্বত্ব
প্রকাশক

প্রচ্ছদ
গুলশান কবীর

মুদ্রণ
কমলা প্রিন্টার্স
৪১ তোপখানা রোড, ঢাকা ১০০০

মূল্য : ২০০.০০ টাকা

THE STORY OF MY LIFE by Helen Keller, Translated by Hasan Mehedi, Published by Engr. Md. Mehedi Hasan, Banglaprakash (A concern of Omicon Group.), 38/2-Kha Tajmahal Market, Ground Floor, Banglabazar, Dhaka 1100.

Local Price in BDT : 200.00 Only
Intl. Price in USD : $ 10.00 Only

ISBN 984-300-000-488-0

www.amarboi.org

দ্য স্টোরি অব মাই লাইফ

www.amarboi.org

এক

এক ধরনের আশঙ্কা নিয়ে আমি আমার জীবনের ইতিহাস লিখতে শুরু করি। আমার মধ্যে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন এক দ্বিধার আবরণ রয়েছে– যা আমার শৈশব জীবনে এক সোনালি কুয়াশার মতো লেগে রয়েছে। আত্মজীবনী লেখার কাজটি বেশ শক্ত। যখনই আমি ছেলেবেলার ধারণাগুলো ভাগে ভাগে সাজাতে চাই– দেখি বাস্তব আর কল্পনা অতীত ও বর্তমানের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। আমার মধ্যে যে নারীসত্তা রয়েছে, তা শৈশবের অভিজ্ঞতাকে কল্পনার খেয়ালে রঞ্জিত করছে। আমার জীবনের প্রথমদিকের বছরগুলোতে স্বতন্ত্র ও উজ্জ্বল কিছু অনুভূতি রয়েছে। পরেরগুলোতে রয়েছে কারাগারের ছায়া। শৈশবের শেষ দিনগুলোর আনন্দ এবং বিষাদ হারিয়ে ফেলেছে তাদের তীব্রতা, তীক্ষ্ণতা। আর আমার শৈশবের বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিস্মরণ ঘটেছে মহৎ আবিষ্কারের উত্তেজনায়। আমার জীবনকাহিনী যাতে একঘেয়ে ও ক্লান্তিকর না হয়, সে জন্য আমি পরম্পরাযুক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণের মাধ্যমে শুধু সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় কাহিনীই বলার চেষ্টা করব।

১৮৮০ সালের ২৭ জুন দক্ষিণ অ্যালবামার একটি ছোট্ট শহর তাসকাম্বিয়ায় আমি জন্মেছিলাম।

বাবার দিক থেকে আমাদের পরিবার ক্যাসপার কেলারের বংশধর। তারা ছিলেন সুইজারল্যান্ডের স্থানীয় অধিবাসী এবং তারা মেরিল্যান্ডে পাকাপাকিভাবে বাস করতে থাকেন। আমার সুইস পূর্বপুরুষদের একজন ছিলেন জুরিখে বধিরদের প্রথম শিক্ষক। তিনি বধিরদের শিক্ষার বিষয়ে একটি বই লিখেছিলেন। একথা সত্যি যে এমন কোনো রাজা নেই যাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ ক্রীতদাস ছিলেন না এবং এমন কোনো ক্রীতদাস নেই যার পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ রাজা ছিলেন না।

আমার দাদা ছিলেন ক্যাসপার কেলারের পুত্র, তিনি অ্যালবামা প্রদেশে বিশাল এলাকা কিনে নিয়েছিলেন। এবং তাঁর পরিবার সেখানেই শেষ পর্যন্ত পাকাপাকিভাবে বাস করতে থাকেন। আমাকে বলা হয়েছে যে, বছরে একবার তিনি ঘোড়ায় চড়ে তাসকাম্বিয়া থেকে ফিলাডেলফিয়া যেতেন চাষাবাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আনতেন। আমার কাকিমার হেফাজতে অনেক পত্র আছে, যেগুলো আমার দাদা পরিবারের কাছে পাঠাতেন। ওগুলোতে সেই ভ্রমণের সুন্দর এবং প্রাণবন্ত বর্ণনা আছে।

আমার দাদিমা ছিলেন লা ফায়েতি'র এক সহকারী আলেকজান্ডার মুরের কন্যা এবং ভার্জিনিয়ার গভর্নর আলেকজান্ডার স্পটসউডের নাতনি। যিনি ছিলেন প্রথম দিকের ভার্জিনিয়া উপনিবেশের গভর্নরদের একজন। দাদিমা ছিলেন আবার রবার্ট ই. লী-এর দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়া।

www.amarboi.org

আমার বাবা আর্থার এইচ. কেলার ছিলেন মৈত্রীবদ্ধ [Confederate] সেনাবাহিনীর ক্যাপটেন এবং আমার মা কেট অ্যাডামস ছিলেন তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী। আমার মা আমার বাবার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ছিলেন। আমার মায়ের দাদা বেঞ্জামিন অ্যাডামস বিয়ে করেছিলেন সুসানা ই. গুডহিউ-কে। তারা ম্যাসাচুসেটসের নিউবারি শহরে অনেক বছর বসবাস করেছিলেন। তাঁদের ছেলে চার্লস অ্যাডামস ম্যাসাচুসেটসের নিউবারি পোর্টে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরে আরকানসাসের হেলেনা শহরে চলে যান। যখন গৃহযুদ্ধ শুরু হয়, তখন তিনি দক্ষিণীদের পক্ষে যুদ্ধ করেন এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হন। তিনি বিয়ে করেন লুসি হেলেন এভারেটকে, যিনি ছিলেন এভারেট পরিবারভুক্ত; যার সদস্য ছিলেন এডওয়ার্ড এভারেট এবং ডা. এডওয়ার্ড এভারেট হেল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর পরিবারটি টেনেসির মেমফিসে চলে যায় বসবাস করার জন্য।

দৃষ্টিশক্তি এবং শোনার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হওয়ার সময় পর্যন্ত আমি বাস করতাম ছোট্ট একটা বাড়িতে। এ বাড়িতে ছিল একটা চতুষ্কোণ বড় ঘর এবং একটা ছোট ঘর– যাতে চাকরেরা ঘুমোত। দক্ষিণ অঞ্চলের রীতিই হচ্ছে বাসভবন ও বাস্তুভূমির কাছে একটা ছোট বাড়ি তৈরি করা, যা অনুষ্ঠানাদির সময় ব্যবহার করা হয়। ঐ রকম একটা বাড়ি আমার বাবা তৈরি করেছিলেন গৃহযুদ্ধের পর এবং আমার মাকে বিয়ে করে ওই ছোট বাড়িতে বসবাস করতে লাগলেন। ঐ বাড়ির সবটাই ছিল আঙুরলতা, লতানো গোলাপ এবং 'হানিসাকেলস্*' নামের পুষ্পবিশেষ দিয়ে ঢাকা। বাগান থেকে বাড়িটা দেখতে কুঞ্জবনের মতো মনে হতো। ছোট গাড়িবারান্দাটা হলুদ গোলাপের পর্দা এবং লতিয়ে ওঠা নানা জাতের গুল্ম দিয়ে ঘেরা থাকায় দৃষ্টির অগোচরে ছিল। 'খঞ্জনী' পাখির মতো ছোট ছোট পাখি এবং মৌমাছিদের প্রিয় ছিল বাড়িটা।

কেলারদের বাসভবন এবং তার সংলগ্ন যে জায়গায় কেলার পরিবার বসবাস করত তা ছিল আমাদের ছোট্ট গোলাপকুঞ্জ থেকে কয়েক পা দূরে। এটাকে বলা হতো 'আইভি গ্রিন'। বাড়িটা এবং তার চারপাশের গাছ এবং বেড়াগুলো ঢাকা ছিল মনোরম ইংল্যান্ডিয় চিরহরিৎ আইভি লতা দিয়ে। পুরোনো কায়দায় সাজানো বাগানটা ছিল আমার শৈশবের স্বর্গোদ্যান।

আমার শিক্ষক আসার আগের দিনগুলোতেও আমি বাগানের শক্ত চিরশ্যামল চৌকো 'বক্সউড্' গাছের বেড়া হাতের ছোঁয়ায় অনুভব করে এগিয়ে যেতাম এবং ঘ্রাণ শক্তির সাহায্যে প্রথমে ভায়োলেট ফুল এবং তারপর পদ্মফুলগুলো খুঁজে নিতাম। আবার রাগ হওয়ার পর ওখানেই হঠাৎ চলে যেতাম সান্ত্বনা পাওয়ার জন্য। অন্য গাছের শীতল ছায়ার আড়ালে এবং ঘাসের মধ্যে আমার উত্তপ্ত মুখমণ্ডল লুকোতাম। কী যে আনন্দ ছিল ফুলের বাগানে নিজেকে হারিয়ে ফেলার মধ্যে এবং এক জায়গা

---

* হানিসাকেলস্ : নলাকার বা লাল রঙের সুগন্ধী ফুলের লতাসমূহ।

www.amarboi.org

থেকে আর এক জায়গায় যাওয়ায়! যতক্ষণ পর্যন্ত হঠাৎ একটা আঙুর গাছ না পেতাম; তা চিনে নিতাম পাতার স্পর্শে, ফুলের ছোঁয়ায়, আর জানতাম ওটা আঙুর লতাই, যা আমাদের বাগানের দূর প্রান্তে থাকা জীর্ণ গ্রীষ্মকালীন বাড়িটাকে ঢেকে রেখেছে। এখানে আরও ছিল পাঁচিলের ওপর দিয়ে লতিয়ে যাওয়া বনলতা, আনত জুঁই এবং আরও কিছু ধরনের দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য মিষ্টি ফুল, যাদের বলা হয় 'বাটারফ্লাই লিলি'। এরকম নাম হওয়ার কারণ তাদের ভঙ্গুর পাপড়িগুলো দেখতে ছিল প্রজাপতির পাখার মতো। আর গোলাপ ফুলগুলো ছিল অন্য যে কোনো ফুল থেকে সুন্দর। আমাদের দক্ষিণের বাড়িতে থাকা লতানো গোলাপের মতো মনমাতানো গোলাপ আমি কখনও উত্তরের গ্রিন হাউসগুলোতে দেখিনি। ঐ লতানো গাছের গোলাপগুলো আমাদের গাড়িবারান্দা থেকে সারি করে মালার মতো ঝুলে থাকত। তাদের সুগন্ধে বাতাস সুবাসিত হতো, যা পার্থিব কোনো গন্ধে কলুষিত হতো না এবং ভোরে শিশির ধোয়া সেইসব গোলাপ এত কোমল অনুভূত হতো, এত নিষ্পাপ মনে হতো যে আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবতাম এরা স্বর্গের নন্দনকাননে ফোটা অমর পুষ্প 'অ্যাস্‌ফোডেল্‌স' কি না!

আমার জীবনের শুরুটা ছিল স্বাভাবিক এবং অন্যান্য শিশুদের জীবনের মতোই সরল। যে কোনো পরিবারের প্রথম সন্তান যেমন করে আসে, আমিও তেমনি এলাম, দেখলাম এবং জয় করলাম। কোনো শিশুর নাম রাখার ব্যাপারে সাধারণত যতটুকু আলোচনা হয়, আমার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তবে পরিবারের প্রথম সন্তানের নাম যাতে লঘু বা হেলাফেলা করে না রাখা হয়, সে ব্যাপারে প্রত্যেকেই জোর দিয়েছিলেন। আমার বাবা প্রস্তাব করেছিলেন আমার নাম রাখা হোক মিলড্রেড ক্যাম্পবেল-এর নামে। এটা আমাদের এক পূর্বসূরীর নাম এবং তাঁকে বাবা খুব শ্রদ্ধা করতেন। এরপর আমার নাম রাখার ব্যাপারে তিনি আর কোনো আলোচনায় অংশ নিতে অস্বীকার করেন। আমার মা সমস্যাটার সমাধান করলেন এই বলে যে তাঁর ইচ্ছে, আমাকে ডাকা হোক তাঁর মায়ের নামে, কুমারী জীবনে যাঁর নাম ছিল হেলেন এভারেট। কিন্তু আমাকে কোলে করে চার্চে নিয়ে যাওয়ার উত্তেজনায়, বাবা পথে নামটা খুব স্বাভাবিক কারণেই হারিয়ে ফেলেন, কারণ এটা ছিল এমন একটা নাম যা ঠিক করার সময় বাবা আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। যাজক যখন আমার নাম কী হবে জানতে চাইলেন, তখন বাবা শুধু এটা মনে করতে পেরেছিলেন যে আমাকে ডাকা হবে দাদির নামে এবং তিনি দাদির নাম জানিয়েছিলেন হেলেন অ্যাডামস।

আমাকে বলা হয়েছে যে, যখন আমি লম্বা পোশাক পরতাম অর্থাৎ ছোট ছিলাম তখনই আমি অনেক কিছুতে আগ্রহ প্রকাশ করতাম এবং আমার স্বভাব ছিল নিজেকে জাহির করা। অন্যদের যা কিছু করতে দেখতাম তা আমি অনুকরণ করতে চাইতাম। ছ'মাস বয়সে আমি বলতে পারতাম, 'How d'ye,' এবং একদিন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম সঠিকভাবে 'Tea, tea, tea' বলে। এমনকি আমার অসুস্থতার পরেও একটা শব্দ মনে করতে পেরেছিলাম যেটা আমি প্রথম দিকের মাসগুলোতে

www.amarboi.org

শিখেছিলাম। সেই শব্দটা ছিল, 'water' এবং সমস্ত কথা হারিয়ে যাওয়ার পরও অর্থাৎ কথা বলা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও ঐ শব্দটা প্রকাশ করার জন্য আমি কিছু ধ্বনি উচ্চারণ করতাম। শব্দটা বানান করতে শেখার পরই আমি 'wah wah' ধ্বনি উচ্চারণ করা বন্ধ করি।

বাড়ির অন্যান্যরা আমাকে বলেন যে, এক বছর বয়সেই নাকি আমি হেঁটেছিলাম। আমার মা সবেমাত্র আমাকে বাথটাব থেকে তুলে এনে তাঁর কোলে রেখেছিলেন, সেই সময় হঠাৎ ঘরের মসৃণ মেঝেতে পাতার কম্পমান ছায়া দেখে আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। আবেগ চলে যেতেই আমি পড়ে গেলাম এবং আমাকে মায়ের কোলে তুলে নেওয়ার জন্য চিৎকার করে কাঁদলাম।

এই সুখের দিনগুলো বেশিদিন স্থায়ী হলো না। একটা সংক্ষিপ্ত বসন্তকাল গীতিময় হয়ে উঠেছিল রবিন পাখির গানে আর অন্য পাখির ডাক নকল করা পাখির আওয়াজে। একটা গ্রীষ্ম ভরে গিয়েছিল ফল আর গোলাপ ফুলে, একটা সোনালি আর গাঢ় লাল রঙে রাঙা শরৎ, সব চলে গিয়েছিল দ্রুততার সাথে। তারা উপহার রেখে গিয়েছিল এক উৎসুক আর আনন্দময় শিশুর পদপ্রান্তে। তারপর এক বিষণ্ন ফেব্রুয়ারি মাসে এলো অসুস্থতা যা আমার চোখ আর কান দুটিকে অকেজো করে দিল, আর আমাকে নিক্ষেপ করল নবজাতকের চেতনশূন্যতার জগতে। চিকিৎসকরা এটাকে বললেন পাকস্থলী এবং মস্তিষ্কের রক্তসঞ্চয়নের জটিলতা। চিকিৎসক ভেবেছিলেন আমি বাঁচব না। একদিন ভোরে আমার জ্বর যেমন হঠাৎ এবং রহস্যজনকভাবে এসেছিল, তেমনি হঠাৎই ছেড়ে গিয়েছিল। সেই সকালে আমাদের পরিবারে আনন্দ-উৎসব পালন করা হয়েছিল। কিন্তু কেউ, এমনকি চিকিৎসকও জানতেন না যে আমি আর কোনোদিনই দেখতে পাব না, শুনতে পাব না।

আমি মনে করি, এখনও সেই অসুস্থতা সম্বন্ধে আমার বিভ্রান্তিকর স্মৃতি রয়েছে। আমি বিশেষভাবে স্মরণ করতে পারি সেই কোমল স্নেহের স্পর্শ যা দিয়ে মা আমার যন্ত্রণাকাতরতা, অস্থিরতা, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তাকে প্রশমিত করতে চেষ্টা করতেন। যা নিয়ে আমি জেগে উঠতাম অস্থির আধো ঘুম থেকে এবং শুষ্ক, তপ্ত চোখ দেয়ালের দিকে ফিরিয়ে নিতাম এক সময়ের ভালোবাসার আলোর দিক থেকে, যে আলো প্রতিদিন আমার কাছে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছিল। কিন্তু এই ক্ষণস্থায়ী স্মৃতিখণ্ডগুলো যদি আদৌ স্মৃতি হয়, তবে সবই আমার অবাস্তব দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়। ক্রমশঃ আমি আমার চারপাশে ঘিরে থাকা নৈঃশব্দ ও অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে উঠলাম এবং ভুলে গেলাম যে আমার জীবন অন্যরকম ছিল যতক্ষণ না তিনি এলেন– আমার শিক্ষিকা যিনি আমার আত্মাকে মুক্তি দিতে এসেছিলেন। কিন্তু আমার জীবনের প্রথম উনিশ মাস আমি বিস্তৃত সবুজ মাঠ, উজ্জ্বল আকাশ, গাছ এবং ফুলের যে আভাস স্মৃতিপটে ধরে রেখেছিলাম, সেগুলোকে পরবর্তী জীবনে আসা অন্ধকার পুরোটা মুছে দিতে পারেনি। যদি আমরা কোনো কিছু একবার দেখি, তাহলে 'সেই দিনটি আমাদের এবং দিনটি যা দেখিয়েছে তাও আমাদের'।

www.amarboi.org

দুই

আমার অসুস্থতার পরের প্রথম মাসগুলোতে কী ঘটেছিল, মনে করতে পারি না। আমি কেবল মনে করতে পারি যে, আমি আমার মায়ের কোলে বসে থাকতাম অথবা যখন তিনি বাড়ির কাজে এদিক ওদিক যেতেন তাঁর পোশাক আঁকড়ে ধরে থাকতাম। আমার হাতদুটো অনুভব করত প্রতিটি বস্তুকে এবং লক্ষ করত প্রতিটি চলার ধরন এবং এভাবে আমি জানতে শিখলাম অনেক কিছু। অল্পদিনের মধ্যেই অন্য সকলের সাথে যোগাযোগ করার প্রয়োজন অনুভব করলাম এবং কিছু অপরিণত সঙ্কেত করতে শুরু করলাম। মাথা ঝাঁকানো বোঝাত 'না' এবং অল্প মাথা নাড়ানো 'হ্যাঁ', কাউকে কাছে টানা বোঝাত 'এসো' এবং ঠেলা বোঝাত 'চলে যাও'। যা আমি চেয়েছিলাম তা কি পাউরুটি? তখন আমি ছুরি দিয়ে পাউরুটি কাটার এবং তাতে মাখন লাগানোর ভঙ্গি নকল করে দেখাতাম। যদি আমি চাইতাম যে আমার মা দিনের প্রধান খাবার হিসাবে আইসক্রিম বানান, তখন আমি রেফ্রিজারেটরের কাজ করার ইশারা করে ঠাণ্ডা বোঝাতে শরীর কাঁপাতাম। তাছাড়া আমার মা অনেক ব্যাপারে আমাকে অনেক কিছু বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। মা আমাকে দিয়ে কিছু আনাতে চাইলে আমি তা সবসময়ই বুঝতে পারতাম এবং আমি ছুটতাম দোতলায় বা অন্য কোনো জায়গায় যেখানে যেতে তিনি ইঙ্গিত করতেন। আমার দীর্ঘ অন্ধকার জীবনে যা কিছু উজ্জ্বল এবং শুভ তার জন্য আমি অবশ্যই আমার মায়ের কাছে ঋণী।

আমার চারপাশে যা কিছু ঘটে চলেছিল তার অনেক কিছুই আমি বুঝতে পারতাম। পাঁচ বছর বয়সেই আমি শিখেছিলাম কাপড় ভাঁজ করতে এবং লন্ড্রি থেকে আনা পরিষ্কার কাপড় যথাস্থানে রাখতে এবং অন্যান্যদের কাপড়ের থেকে আমার নিজের কাপড়গুলো আলাদা করতে। মা এবং কাকিমার পোশাক পরার ধরন থেকে বুঝতে পারতাম কখন তাঁরা বাইরে যাবেন এবং নিশ্চিতভাবেই তাঁদের সাথে যাওয়ার জন্য আবদার করতাম। বাড়িতে কোনো লোকজন এলে আমাকে ডাকা হতো এবং যখন অতিথিরা বিদায় নিতেন, তখন আমি হাত নেড়ে তাঁদের বিদায় জানাতাম। এই ইশারা বা ইঙ্গিতের অর্থ আমি আবছাভাবে মনে করতে পারি। একদিন কয়েকজন ভদ্রলোক মায়ের সাথে দেখা করতে আসেন এবং আমি বাড়ির সদর দরজা বন্ধ করার শব্দ এবং অন্যকিছু শব্দ অনুভব করলাম, যা তাঁদের আগমনের ইঙ্গিত দিয়েছিল। হঠাৎ একটা ভাবনা আমার মাথায় এলো এবং কেউ আমাকে বাধা দেওয়ার আগেই আমার ভাবনায় অতিথিদের সামনে যেমন পোশাক পরা উচিত সেরকম পোশাক পরতে দৌড়ে ওপরতলায় চলে গেলাম । আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমি অন্যদের যেভাবে তেল মাখতে দেখেছিলাম সেভাবে তেল মাখলাম এবং ঘন করে পাউডারে মুখ ঢেকে নিলাম। তারপর একটা ওড়না পিন দিয়ে আমার মাথার

www.amarboi.org

ওপরে এমনভাবে লাগালাম যাতে ওটা আমার মুখ ঢেকে রাখে এবং কাঁধের ওপর ভাঁজ হয়ে ঝুলতে থাকে। এরপর আমি একটা বিশাল প্যাড বাঁধলাম আমার ছোট্ট কোমর ঘিরে যা স্কার্টের নিচে পিছনের দিকে এবং প্রায় আমার স্কার্টের প্রান্তভাগ স্পর্শ করে ঝুলতে থাকল। এইভাবে সেজে আমি নিচে নেমে গিয়েছিলাম অতিথিদের আপ্যায়নের ব্যাপারে সাহায্য করতে।

আমি মনে করতে পারি না কখন আমি প্রথম উপলব্ধি করেছিলাম যে আমি অন্য মানুষের চেয়ে পৃথক; তবে আমার শিক্ষিকা আসার আগেই এটা আমি জেনেছিলাম। আমি লক্ষ করেছিলাম যে আমার মা, আমার বন্ধুরা কোনো কাজ করতে চাইলে ইশারা করে না, তারা মুখ দিয়ে কথা বলে। কখনও কখনও আলাপরত দুজনের মাঝে গিয়ে দাঁড়াতাম এবং তাদের ঠোঁট স্পর্শ করতাম। আমি কিছু বুঝতে পারতাম না, বরং বিরক্ত হতাম। আমি আমার ঠোঁট নাড়াতাম এবং অঙ্গভঙ্গি করতাম ক্ষ্যাপার মতো, কিন্তু কোনো ফল হতো না। এই ব্যাপারটা আমাকে কখনও কখনও এত রাগিয়ে দিত যে আমি পা ছুঁড়তাম এবং তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করতাম যতক্ষণ না আমি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়তাম।

আমার মনে হয় আমি জানি কখন আমি দুষ্টু ছিলাম, কারণ আমি জানতাম যে আমার নার্স এলাকে লাথি মারলে তা তাকে আহত করত এবং যখন আমার রাগ পড়ে যেত, আমার মনে অনুশোচনার মতো অনুভূতি হতো। কিন্তু আমি এমন কোনো ঘটনা মনে করতে পারি না যাতে এই অনুশোচনা আমাকে আবার ওই দুষ্টুমি করায় বাধা দিত এবং আমি যা চাইতাম তা না পেলে এরকম দুষ্টুমি করতাম।

সেই সব দিনে একটি ছোট অশ্বেতকায় মেয়ে মার্থা ওয়াশিংটন, আমাদের রাঁধুনির মেয়ে এবং একটা বুড়ো শিকারী কুকুর বেলে, একসময়ের বড় শিকারী– দুজনই আমার সঙ্গী ছিল। মার্থা ওয়াশিংটন আমার ইশারার অর্থ বুঝতে পারত এবং খুব কম সময়ই তাকে দিয়ে যা করাতে চাইতাম তা তাকে বোঝাতে আমার অসুবিধে হতো। তার ওপর কর্তৃত্ব ফলাতে আমার ভালো লাগত এবং সাধারণত সে আমার সাথে হাতাহাতি করার ঝুঁকি নেওয়ার চেয়ে আমার নিষ্ঠুরতার কাছে নিজেকে সমর্পণ করাকে ভালো বলে মনে করত। আমি ছিলাম শক্তিশালী, কর্মতৎপর এবং কোনো কাজের ফলাফল সম্বন্ধে উদাসীন। আমি নিজেকে যথেষ্ট ভালোভাবে বুঝতাম, আর চলতাম নিজের খেয়ালে এবং এ জন্য আমি লড়াই পর্যন্ত করতে প্রস্তুত ছিলাম। আমরা ময়দা মেখে লেচি করে, আইসক্রিম তৈরিতে সাহায্য করে, কফি গুঁড়ো করে, কেক বানানোর বাটি নিয়ে ঝগড়া করে, আর রান্নাঘরের সিঁড়ির চারপাশে ঝাঁক বেঁধে চরে বেড়ানো মুরগি এবং টার্কিদের খাওয়ানোর কাজ করে রান্নাঘরে অনেক সময় কাটাতাম। মুরগি ও টার্কির অনেকগুলো এত পোষমানা ছিল যে আমার হাত থেকেই খেত এবং আমাকে তাদের ধরতে দিত। একদিন একটা বড় টার্কি মোরগ আমার হাত থেকে একটা টমেটো ছিনিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল। সম্ভবত ঐ সর্দার টার্কিটার সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি রাঁধুনির সদ্য তৈরি করা একটা কেক তুলে নিয়ে

www.amarboi.org

জ্বালানির জন্য রাখা কাঠের স্তূপের কাছে গিয়ে পুরোটাই খেয়ে ফেলেছিলাম। এরপর আমি বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, এবং আশ্চর্য হয়ে ভাবি এরকম প্রতিশোধের কবলে টার্কিটাও পড়েছিল কিনা।

গিনি মুরগি বিচিত্র সব জায়গায় বাসা তৈরি করত এবং ডিম পাড়ত এবং আমার সবচেয়ে বেশি আনন্দ ছিল লম্বা ঘাসের মধ্য থেকে সেই ডিম খুঁজে বের করা। আমি ডিম খুঁজতে যাওয়ার সময় মার্থাকে ঠিকমতো বোঝাতে পারতাম না। তখন দুটো হাত জড়ো করে মাটিতে রাখতাম যার অর্থ ছিল ঘাসের মধ্যে থাকা গোল কিছু। মার্থা সবসময়ই আমার ইশারা-ইঙ্গিতের কথা বুঝতে পারত। সৌভাগ্যক্রমে কোনো দিন পাখির বাসা খুঁজে পেলে মার্থাকে কখনই ডিমগুলো বয়ে বাড়ি নিয়ে যেতে অনুমতি দিতাম না। অত্যন্ত জোরালো ইঙ্গিত করে বুঝিয়ে দিতাম যে, সে হয়ত ওগুলো মাটিতে ফেলে দেবে এবং ভেঙে ফেলবে।

যে সব চালাঘরে শস্য মজুত করা হতো, যে আস্তাবলে ঘোড়াদের রাখা হতো এবং যে উঠোনে সকালে ও বিকালে গরুদের দুধ দোয়ানো হতো, সে সব জায়গা ছিল আমার আর মার্থার কাছে অফুরান আগ্রহের উৎস। যারা দুধ দোয়াত, তারা আমাকে গরুগুলোর গায়ে হাত রাখতে দিত এবং প্রায়ই আমার কৌতূহলের জন্য আমাকে গরুর গুঁতো খেতে হতো।

আমার কাছে বড়দিনের উৎসবের জন্য প্রস্তুত হওয়াটা সব সময়ই আনন্দের ছিল। আমি জানতাম না বড়দিনের ব্যাপারটা ঠিক কী, কিন্তু উপভোগ করতাম। মনোরম গন্ধে আমাদের বাড়ি ভরে থাকত এবং আমাকে ও মার্থা ওয়াশিংটনকে শান্ত রাখার জন্য বাছাই করা মুখরোচক খাবার দেওয়া হতো। আমরা বাড়ির কাজে বাধা সৃষ্টি করতাম, তা অবশ্য আমাদের আনন্দে বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত ঘটাত না। বড়রা আমাদের মশলা বাটতে দিত, কিসমিস বাছাই করতে দিত এবং খাবার নাড়ার চামচগুলো চাটতে দিত। আমি মোজা ঝুলিয়ে রাখতাম কারণ অন্যরা তা করত। আমি অবশ্য মনে করতে পারি না এই উৎসব আমাকে বিশেষভাবে কোনো আনন্দ দিত কিনা। ভোরের আলো ফোটার আগে কী উপহার পেলাম তা দেখার জন্য আমার কৌতূহল আমাকে জাগাত না।

মার্থা ওয়াশিংটনেরও ছিল আমার মতোই দুষ্টুমির প্রতি প্রচণ্ড ঝোঁক। দুটো ছোট্ট শিশু বারান্দার সিঁড়িতে বসেছিল জুলাই মাসের এক তপ্ত বিকেলে। একজন আবলুস কাঠের মতো কালো ছিল। তার মাথায় গোছা গোছা আঁশের মতো চুল, জুতোর ফিতে দিয়ে বাঁধার পরও ছিপি খোলা যন্ত্রের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে মাথার ওপর লেগে ছিল। অন্যজন ছিল ফর্সা এবং লম্বা সোনালি কুঞ্চিত কেশ। একটি শিশু ছ'বছর বয়সী, অন্যজন তার থেকে দু-তিন বছরের বড়। বয়সে ছোট মেয়েটি ছিল অন্ধ— সেটা ছিলাম আমি এবং অন্যজন ছিল মার্থা ওয়াশিংটন। আমরা ব্যস্ত ছিলাম কাগজ কেটে পুতুল বানাতে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই এই মজায় ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। আমাদের জুতোর ফিতেগুলো কাটার এবং হাতের নাগালের মধ্যে থাকা লতানো ফুল

www.amarboi.org

গাছের পাতাগুলো ছাঁটার পর, আমি মার্থার ছিপি খোলা যন্ত্রের মতো কুণ্ডুলী পাকিয়ে থাকা চুলগুলোর দিকে মনোযোগ দিলাম। সে প্রথমে আপত্তি করেছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করেছিল। খেলার সুযোগ পরপর ঘুরে আসা উচিত ভেবে, সে কাঁচিটা নিয়ে আমার কোঁকড়ানো সোনালি চুলের একটা গোছা কেটে ফেলল। সে সবগুলোই কেটে ফেলত যদি না আমার মা সময়মতো বাধা দিতেন।

আমাদের কুকুর, বেলে ছিল আমার অপর সঙ্গী। সে ছিল বুড়ো এবং অলস। সে আমার সাথে হৈ চৈ করে খেলাধুলা করার চেয়ে বেশি পছন্দ করত খোলা আগুনের পাশে ঘুমোতে। আমি তাকে আমার ইশারার ভাষা শেখাতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সে ছিল স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন এবং অমনোযোগী। সে কখনও কখনও চমকে উঠত এবং উত্তেজনায় কাঁপত, যেমন কুকুরেরা কোনো পাখি দেখলে করে। আমি তখন জানতাম না কেন বেলে এই ধরনের আচরণ করত; কিন্তু আমি জানতাম আমি যা চাইতাম সে তা করত না। এটা আমাকে বিরক্ত করত এবং শিক্ষাটা সবসময়ই শেষ হতো একতরফা মুষ্টিযুদ্ধের মতো। বেলে উঠে দাঁড়াত, অলসভাবে আড়মোড়া ভাঙত, দু-একবার অবজ্ঞাভরে নাক সিটকাত এবং চলে যেত উনানের অপর দিকে এবং আবার শুয়ে পড়ত। আর আমি ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে মার্থার খোঁজে চলে যেতাম।

সেই প্রথম বছরগুলোর অনেক ঘটনা আমার স্মৃতিতে গভীরভাবে গেঁথে আছে। বিচ্ছিন্নভাবে হলেও সেগুলো কিন্তু পরিষ্কার এবং স্পষ্টভাবেই জেগে রয়েছে যা আমার মূক, লক্ষহীন, জীবনকে করেছিল আরও তীব্র আবেগময়।

একদিন আমি আমার অ্যাপ্রনে জল ফেলে ভিজিয়েছিলাম এবং সেটাকে শুকিয়ে নেবার জন্য বসার ঘরে কেঁপে কেঁপে জ্বলতে থাকা চুল্লির সামনে ছড়িয়ে রেখেছিলাম। অ্যাপ্রনটা যত তাড়াতাড়ি চেয়েছিলাম তত তাড়াতাড়ি শুকোল না, তাই আমি চুল্লীর কাছে গেলাম এবং ওটাকে গরম ছাই-এর ওপর ছুঁড়ে দিলাম। ফলে ধপ করে আগুন জ্বলে উঠল এবং আমাকে ঘিরে ফেলল। মুহূর্তের মধ্যে আমার জামাকাপড় জ্বলতে থাকল। আমি ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম। আমার বৃদ্ধা নার্স ভিনি চিৎকার শুনে আমাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এলো। সে আমার ওপর একটা কম্বল ছুঁড়ে দিয়ে আমার দম প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিল। তবে সে আগুন নিভিয়ে দিয়েছিল। হাত আর চুল ছাড়া আমি খুব বেশি খারাপভাবে পুড়ে যাইনি।

মোটামুটি এই সময়েই আমি চাবির ব্যবহার শিখেছিলাম। একদিন আমি আমার মাকে ভাঁড়ার ঘরে তালা বন্ধ করে রেখেছিলাম। সেখানে তিনি তিন ঘণ্টা আটকে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন কেননা বাড়ির চাকররা থাকত বাড়ির একটা আলাদা অংশে। মা বারবার দরজার ওপর জোরে আঘাত করছিলেন আর আমি গাড়ি-বারান্দার সিঁড়িতে বসে দরজা ধাক্কানোর ঝাঁকুনি অনুভব করে খুব মজা পেয়েছিলাম। আমার এই দুষ্টুমি দেখে আমার মা-বাবা নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, যত দ্রুত সম্ভব আমাকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। আমার শিক্ষিকা মিস সুলিভান এলে আমি যত

www.amarboi.org

তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁকে তাঁর ঘরে তালা বন্ধ করে রাখার সুযোগ খুঁজতে লাগলাম। একদিন মিস সুলিভানকে দেওয়ার জন্য একটা কিছু নিয়ে যাচ্ছিলাম দোতলায়। তাকে ওটা দেয়ার কথা মা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন এবং যে মুহূর্তে আমি সেটা তাঁকে দিলাম, সেই মুহূর্তেই সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে তাতে তালা লাগিয়ে দিলাম এবং চাবিটা হলঘরের পোশাকের আলমারির নিচে লুকিয়ে রাখলাম। কেউ আমাকে বলাতে পারেনি আমি চাবিটা কোথায় রেখেছিলাম। উপায় না দেখে বাবা বাধ্য হলেন একটা মই এনে জানালা দিয়ে মিস সুলিভানকে বের করে আনতে। এতে আমার খুব আনন্দ হয়েছিল। বেশ কয়েক মাস পরে আমি চাবিটা বার করে দিয়েছিলাম।

যখন আমি প্রায় পাঁচ বছর বয়সের, তখন আমরা আঙুর লতায় ছাওয়া আমাদের ছোট্ট বাড়িটা ছেড়ে একটা নতুন বাড়িতে উঠে আসি। আমাদের পরিবারে ছিল বাবা, মা, আমার বড় দুই সৎভাই আর আমার ছোট বোন মিলড্রেড। বাবার সম্বন্ধে আমার স্পষ্ট যে স্মৃতি আছে, সেটা হলো, চারদিকে ছড়িয়ে থাকা খবরের কাগজের মধ্যে বাবা তাঁর মুখের সামনে একটা কাগজ ধরে বসে আছেন। আমি খুবই ধাঁধায় থাকতাম এই ভেবে যে আসলে তিনি কী করছেন। আমি তাঁর কাজ নকল করতাম, এমনকি তাঁর চশমাটাও পরতাম। কারণ আমি ভাবতাম ওগুলো রহস্য উন্মোচনে সাহায্য করবে। কিন্তু বহু বছর আমি সে রহস্যের সমাধান খুঁজে পাইনি। পরে আমি জানতে পেরেছিলাম ঐ কাগজগুলো কী এবং আমার বাবা ঐ কাগজগুলোর একটা সম্পাদনা করতেন।

আমার বাবা ছিলেন অত্যন্ত স্নেহশীল এবং প্রশ্রয়দানকারী মানুষ। তিনি অনুরক্ত ছিলেন বাড়ির প্রতি এবং শিকারের মওসুম ছাড়া খুব কমই আমাদের ছেড়ে থাকতেন। আমাকে বলা হয়েছে যে বাবা ছিলেন একজন দক্ষ শিকারী এবং বন্দুক চালনায় একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। পরিবারের মানুষদের পরই তিনি ভালোবাসতেন তাঁর কুকুরদের এবং তাঁর বন্দুকটিকে। তাঁর অতিথিপরায়ণতা ছিল অসাধারণ এবং এটা প্রায় দোষের পর্যায়ে পড়ত। এমন খুব কমই ঘটত যে তিনি কোনো অতিথি না নিয়ে বাড়িতে এসেছেন। তাঁর গর্বের বস্তু ছিল বিশাল বাগানটা। তাঁর ব্যাপারে বলা হতো যে তিনি দেশের মধ্যে সবচেয়ে ভালো তরমুজ এবং স্ট্রবেরি ফলাতেন; এবং আমার জন্য তিনি পাকা আঙুর এবং সবচেয়ে ভালো বৈঁচি জাতীয় ফল নিয়ে আসতেন। আমি স্মরণ করতে পারি তাঁর স্নেহস্পর্শ, যখন তিনি আমাকে এক আঙুর গাছ থেকে অন্য আঙুর গাছের কাছে নিয়ে যেতেন এবং সে সব জিনিস আমাকে খুশি করত, সেগুলোতেই ছিল তাঁর আগ্রহ মিশ্রিত আনন্দ।

তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত গল্প-বলিয়ে। আমি ভাষা আয়ত্ত করার পর তিনি আমার হাতে জোবড়া-জোবড়া করে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত সত্যি কাহিনীগুলো লিখতেন। কোনো কোনো সুবিধাজনক সময়ে আমি সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করলে তিনি যে আনন্দ পেতেন তা অন্য কোনো কিছুতেই পেতেন না।

www.amarboi.org

আমি তখন উত্তর অঞ্চলে ছিলাম এবং ১৮৯৬ সালের গ্রীষ্মের শেষ মনোরম দিনগুলো উপভোগ করছিলাম। ওই সময় আমি আমার বাবার মৃত্যুসংবাদ শুনলাম। তিনি অল্পসময় রোগে ভুগেছিলেন, অল্প সময়ের জন্য অসুস্থতাজনিত তীব্র কষ্ট পেয়েছিলেন। তারপর সব শেষ হয়ে গিয়েছিল। এটা ছিল আমার জীবনে প্রথম পাওয়া গভীর দুঃখ– মৃত্যু সম্পর্কে প্রথম অভিজ্ঞতা।

আমি আমার মায়ের কথা কীভাবে লিখব? তিনি আমার এত কাছের মানুষ ছিলেন যে তাঁর সম্বন্ধে আলাদা করে বলা স্থূল হবে।

বহুকাল আমি আমার ছোটবোনকে এক অবাঞ্ছিত আগন্তুক বলে মনে করতাম। আমি জেনেছিলাম যে আমি আর মায়ের একমাত্র প্রিয় সন্তান নই এবং এই চিন্তা আমার মনকে ঈর্ষায় ভরিয়ে তুলত। ছোটবোন সবসময় মায়ের কোলে বসে থাকত, যেখানে একসময় আমি বসতাম এবং আমার মনে হতো ও একাই মায়ের সবটুকু আদর আর সময় নিয়ে নিচ্ছে। একদিন এমন একটা কিছু ঘটেছিল যা আমার যন্ত্রণাকাতর মনে অপমানের অনুভূতি এনে দিয়েছিল।

সে সময় আমার একটা পুতুল ছিল। আমার খুব আদুরে। ওর নাম রেখেছিলাম ন্যান্সি। হায়, সে ছিল অসহায় শিকার– আমার রাগের বিস্ফোরণের আর ভালোবাসার অত্যাচারের অসহায় শিকারে পরিণত হয়েছিল সে। তাই সে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে উঠেছিল। আমার এমন সব পুতুল ছিল যেগুলো কথা বলত, কাঁদত, চোখ খুলত, আবার চোখ বন্ধ করত। তবু আমি বেচারা ন্যান্সিকে যত ভালোবাসতাম তত আর কাউকে বাসিনি। তার একটা দোলনা ছিল এবং আমি এক ঘণ্টা বা তার চেয়ে বেশি সময় ধরে তাকে দোল দিতাম। আমি পুতুলটা আর দোলনাটা সতর্কতার সাথে পাহারা দিতাম; কিন্তু একবার আবিষ্কার করলাম যে আমার ছোট বোনটি দোলনাটায় আরাম করে ঘুমোচ্ছে। যার সাথে আমার কোনো ভালোবাসার সম্বন্ধই গড়ে উঠেনি এমন একজনের অসঙ্গত আচরণে আমি রেগে গেলাম। আমি দোলনার দিকে ছুটে গেলাম এবং সেটাকে উল্টে দিলাম। সেদিন শিশুটির মৃত্যু হতে পারতো যদি না আমার মা পড়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তে তাকে লুফে নিতেন। এটা এরকমই হয় যখন আমরা গভীর নৈঃশব্দের উপত্যকায় হেঁটে যাই, তখন আমরা জানতেও পারি না যে, সুমিষ্ট কথা, কার্যধারা এবং সাহচর্য থেকে সুকোমল ভালোবাসা জন্ম নেয়। পরে যখন মানবিক উত্তরাধিকার অর্থাৎ বোধ ফিরে পেলাম তখন মিলড্রেড এবং আমি একে অপরের অন্তরঙ্গ সুহৃদ হয়েছিলাম। যার ফলে আমরা দুজন হাত ধরাধরি করে খেয়ালখুশি মতো ঘুরে বেড়াতাম। যদিও সে আমার আঙুলের ভাষা বুঝতে পারত না আর আমিও তার শিশুসুলভ কলকলানির কোনো অর্থ বুঝতে পারতাম না।

www.amarboi.org

তিন

ইতোমধ্যে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করার ইচ্ছা আমার মধ্যে জেগে উঠতে থাকে। যে অল্প কটি ইশারা আমি ব্যবহার করতে পারতাম, ক্রমশই সেগুলো অপর্যাপ্ত মনে হতে লাগল, আর নিজেকে ঠিকমতো বোঝাতে না পারার অক্ষমতা নিশ্চিতভাবে আমার ক্রোধের বিস্ফোরণ ঘটাতে লাগল। আমার মনে হতে লাগল একটা অদৃশ্য হাত যেন আমায় আটকে রেখেছে এবং তা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে খুব চেষ্টা করতাম। আমি ভেতরে ভেতরে সংগ্রাম করতে লাগলাম। প্রতিরোধের এই মনোভাব আমাকে যে খুব একটা সাহায্য করেছিল তা নয় কিন্তু ঐ প্রতিরোধের মনোভাব আমার মধ্যে গভীরভাবে গেঁথে ছিল। আমি সাধারণত কান্নায় আর শারীরিক অবসাদে ভেঙে পড়তাম। মা যদি কোনো কারণে কাছাকাছি থাকতেন, তবে আমি মায়ের বাহুতে আশ্রয় নিতাম এবং দুঃখে এত কাতর হয়ে পড়তাম যে কী কারণে আমার মধ্যে ঝড় বয়ে গেছে তা মনে করতে পারতাম না। কিছু সময়ের পর অন্য সকলের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করাটা এতটা জরুরি বলে মনে হলো যে প্রতিদিন বা কখনও ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঐ ধরনের অস্থিরতার প্রকাশ ঘটতে থাকল।

আমার এই অবস্থা দেখে আমার বাবা-মা গভীরভাবে দুঃখিত এবং বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। আমরা অন্ধ এবং বধিরদের স্কুল থেকে অনেক দূরে বাস করতাম এবং তাসকাম্বিয়ার মতো একটা দূরের জায়গায় কেউ একটি অন্ধ এবং বধির শিশুকে পড়াতে আসবে এমন সম্ভাবনা কম ছিল। এমনকি আমার বন্ধু এবং আত্মীয়রা আমাকে কোনো দিন লেখাপড়া করানো যাবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতেন। ডিকেন্স-এর লেখা 'আমেরিকান নোটস্' থেকে আমার মায়ের মনে একমাত্র আশার আলো এসেছিল। তিনি ডিকেন্স-এর 'লরা ব্রিজমানের বিবরণী' পড়েছিলেন এবং খুব অস্পষ্টভাবে মনে করতে পেরেছিলেন যে সে বধির এবং অন্ধ ছিল, কিন্তু শিক্ষিত ছিল। তবে আমার মা এই কথা মনে করে হতাশ হয়েছিলেন এবং গভীর বেদনা অনুভব করেছিলেন যে ডাক্তার হয়ে যিনি বধির এবং অন্ধদের শিক্ষণের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন তিনি বহু বছর আগে মারা গিয়েছিলেন। তাঁর পদ্ধতিগুলো সম্ভবত তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথেই শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং যদি সেগুলো শেষ হয়ে গিয়ে না-ও থাকে, তা হলেও আলবামার বহু দূরের কোনো শহরে কোনো ছোট মেয়ে সেই পদ্ধতির সুফল কীভাবে পাবে।

আমি যখন প্রায় ছয় বছর বয়সের ছিলাম, তখন আমার বাবা বাল্টিমোর এর এক বিশিষ্ট চোখের ডাক্তারের কথা শুনেছিলেন। তিনি এই ধরনের আশাহীন বহু রোগের চিকিৎসা করে সাফল্য লাভ করেছিলেন। আমার চোখে আলো ফোটাতে মা-বাবা দ্রুত আমাকে বাল্টিমোরে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

www.amarboi.org

আমার খুব মনে পড়ছে– আমাদের সেই ভ্রমণ ছিল খুবই আনন্দদায়ক। আমি ট্রেনের বহু লোকের সাথে বন্ধুত্ব করেছিলাম। একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা আমাকে এক বাক্স ঝিনুক দিয়েছিলেন। আমার বাবা ওগুলো ফুটো করে দিয়েছিলেন যাতে আমি তাতে সুতো পরিয়ে মালা গাঁথতে পারি এবং দীর্ঘ সময় ধরে সেগুলো আমাকে সুখী এবং পরিতৃপ্ত করে রেখেছিল। কনডাকটার ভদ্রলোকটিও ছিলেন দয়ালু। তিনি প্রায়ই যখন যাত্রীদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে যেতেন এবং টিকিট পাঞ্চ করে তাদের দিতেন, আমি তাঁর কোটের পিছনের দিকে ঝুলে থাকা অংশটিকে ধরে থাকতাম। তাঁর পাঞ্চ মেশিনটা দিয়ে তিনি আমাকে খেলতে দিতেন। ওটা ছিল একটা আনন্দদায়ক খেলনা। সীটের এককোণে গুটি-সুটি মেরে বসে আমি মনের আনন্দে কয়েক ঘণ্টা ধরে কাডবোর্ডের টুকরোয় মজার ছোট ছোট গর্ত করতাম।

আমার কাকিমা তোয়ালে দিয়ে আমাকে একটা বড় পুতুল তৈরি করে দিয়েছিলেন। এটা ছিল সবচেয়ে হাস্যকর আকৃতিহীন একটা বস্তু। পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই হাতের কাছে পাওয়া বস্তু দিয়ে তৈরি হয়েছিল এ পুতুল। এ পুতুলের না ছিল নাক, না ছিল মুখ, কান অথবা চোখ। এমনকি একটি শিশুও কল্পনা দিয়ে ওটাকে পূর্ণ মুখমণ্ডলে পরিবর্তিত করতে পারত না। অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে পুতুলটার অন্যান্য ত্রুটির চেয়ে চোখের অনুপস্থিতি আমাকে বেশি আঘাত করেছিল। আমি প্রত্যেককেই এই ব্যাপারটার প্রতি অনবরত দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করতাম, জ্বালাতন করতাম, কিন্তু কেউই পুতুলটার চোখের ব্যবস্থা করে দেয়নি। যাই হোক, একটা চমৎকার চিন্তা আমার মনে উদয় হলো এবং সমস্যাটারও সমাধান হলো। আমি আমার আসন থেকে গড়িয়ে গিয়ে তার তলায় কাকিমার হাতাহীন কোটটা খুঁজতে থাকলাম। ঐ কোটটা বড় বড় পুঁতি দিয়ে সাজানো ছিল। আমি ওটা থেকে দুটি পুঁতি টেনে খুলে নিলাম তারপর কাকিমাকে ইঙ্গিতে বোঝালাম যে আমি চাই তিনি ওই দুটি আমার পুতুলের চোখে সেলাই করে দিন। তিনি জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে আমার হাত তুলে তাঁর চোখে রাখলেন আর আমি উৎসাহের সাথে মাথা ঝাঁকালাম। পুঁতি দুটি ঠিক জায়গায় সেলাই করা হয়েছিল কিন্তু ওটাকে নিয়ে আনন্দ পেলাম না কারণ অচিরেই আমি পুতুলটার ব্যাপারে সব উৎসাহ হারিয়ে ফেললাম। ট্রেন যাত্রার সময় পুরো পথে আমার মেজাজ খারাপ হয়নি, কারণ আমার মন এবং আঙুলগুলোকে ব্যস্ত রাখার জন্য সেখানে অনেক জিনিস ছিল।

আমরা বাল্টিমোরে পৌছার পর ডা. ক্রীসহোম আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য তিনি আমার চোখের ব্যাপারে কিছুই করতে পারলেন না। তিনি অবশ্য বলেছিলেন আমাকে শিক্ষিত করা যেতে পারে এবং তিনি আমার বাবাকে ওয়াশিংটনে গিয়ে ড. আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেলের সাথে আলাপ করার পরামর্শ দিলেন। তিনি আরও জানালেন ড. বেল অন্ধ ও বধিরদের স্কুল এবং শিক্ষকদের সম্বন্ধে খবর দিতে পারবেন। ডাক্তারের পরামর্শ মতো আমরা ওয়াশিংটনে ড. বেলের সাথে দেখা করতে গেলাম। এই সময় বাবার মন ছিল বিষাদ

www.amarboi.org

এবং আশঙ্কায় পূর্ণ। আমি অবশ্য তাঁর মানসিক যন্ত্রণা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম। যেহেতু আমি ছিলাম একটি শিশু, সেজন্য আমি. ড. বেলের দরদ এবং সহানুভূতি, যা ড. বেলকে বহু মানুষের কাছে প্রিয় করেছিল, তা অনুভব করতে পেরেছিলাম। তাঁর বিস্ময়কর সাফল্যের কাজগুলো সকলের প্রশংসা লাভ করেছিল। তিনি আমাকে তাঁর কোলে বসিয়ে আদর করেছিলেন। ঐ সময় আমি তার ঘড়িটা নিয়ে খেলছিলাম এবং তিনি ঘড়িটির এলার্ম বাজিয়েছিলেন। তিনি আমার ইশারা বুঝতে পেরেছিলেন। এটা বুঝতে পেরে সাথে সাথে আমি তাঁকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম। কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিনি যে ঐ সাক্ষাৎকারটিই হবে সেই দরজা যা অতিক্রম করে আমি পৌঁছে যাব গাঢ় অন্ধকার থেকে উজ্জ্বল আলোতে, নিঃসঙ্গতা থেকে বন্ধুত্বে, সাহচর্যে, জ্ঞান আর ভালোবাসায়।

ড. বেল বাবাকে মি. অ্যানাগ্‌নসকে চিঠি লেখার পরামর্শ দিলেন। বোস্টনে ড. হোয়ের প্রতিষ্ঠিত মহান সংস্থা পার্কিনস্ ইনস্টিটিউশনের পরিচালক ছিলেন মি. অ্যানাগ্‌নস। ড. বেল বাবাকে বলেছিলেন অ্যানাগ্‌নসের কাছে আমার শিক্ষা শুরু করার উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো শিক্ষক আছেন কি না সে সম্পর্কে খোঁজ নিতে। বাবা সাথে সাথেই চিঠি লিখলেন এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই মি. অ্যানাগ্‌নসের কাছ থেকে একটি মমতাভরা চিঠি এলো যাতে তিনি জানালেন যে একজন শিক্ষক পাওয়া গেছে। এটা ছিল ১৮৮৬ সালের গ্রীষ্মকাল। কিন্তু আমার শিক্ষিকা মিস সুলিভান পরের বছর মার্চ মাসের আগে এসে পৌঁছোলেন না।

এইভাবে আমি মিশর থেকে বেরিয়ে এসে সিনাই এর সামনে দাঁড়ালাম এবং একটা ঐশ্বরিক শক্তি আমাকে স্পর্শ করল যা আমাকে এক ভিন্নরকম দৃষ্টিশক্তি দিল যা দ্বারা আমি অনেক আশ্চর্যজনক জিনিস দেখতে পেলাম এবং সেই পবিত্র পর্বত থেকে একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম : 'জ্ঞানই হলো ভালোবাসা, আলো এবং দৃষ্টিশক্তি।'

www.amarboi.org

চার

যে দিন আমার শিক্ষিকা মিস অ্যানে ম্যান্সফিল্ড সুলিভান আমার কাছে এসেছিলেন, সে দিন আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন। যখন দেখেছিলাম এই দিনটি কীভাবে সীমাহীন ব্যবধানের দুটি জীবনের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছিল, আমি বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিলাম। এটা ছিল ১৮৮৭ সালের ৩ মার্চ, আমার সাত বছর পূর্ণ হতে তখনও তিন মাস বাকি।

সেই ঘটনাবহুল দিনটির বিকেলবেলা কিছুটা প্রত্যাশা নিয়ে আমি গাড়ি-বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম। মায়ের ইশারা ও বাড়ির সকলের ব্যস্ততা থেকে আমি অস্পষ্টভাবে অনুমান করছিলাম যে সেদিন আলাদা কিছু একটা ঘটতে চলেছে, তাই আমি দরজার কাছে গিয়ে সিঁড়িতে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বিকেলের সূর্যালোক গাড়ি-বারান্দায় ছেয়ে থাকা হানিসাকেল গাছের ফাঁক দিয়ে আমার মুখে এসে পড়েছিল। আমার আঙুলগুলো প্রায় আমার অজান্তেই অতি পরিচিত পাতা, কুঁড়ি এবং ফুলকে জড়িয়েছিল যেগুলো সবেমাত্র বসন্তের মিষ্টি দখিনা বাতাসকে অভিবাদন করছিল। আমি জানতাম না ভবিষ্যত আমার জন্য বিস্ময়কর অভাবনীয় কিছু রেখেছে কিনা। রাগ এবং তিক্ততা আমাকে বহু সপ্তাহ ধরে বারবার পীড়া দিচ্ছিল এবং এক ধরনের অবসন্নতা আমাকে গ্রাস করেছিল।

তুমি কি কখনও ঘন শাদা কুয়াশায় ঢাকা সমুদ্রে গিয়েছ? যে সমুদ্র দেখে মনে হবে যেন স্পর্শ দ্বারা তা অনুভব করা যায়। এমন এক শাদা আঁধার তোমাকে বন্দি করে রেখেছে আর সেই বিশাল জাহাজ উৎকণ্ঠায় আর চাপা উত্তেজনায় জলের গভীরতা মাপা ওলন দড়ি এবং তার শেষ প্রান্তে বাঁধা ভার জলে ফেলে অন্ধের মতো হাতড়াতে হাতড়াতে এগিয়ে চলেছে তীরের দিকে। কিংবা কিছু একটা ঘটতে পারে ভেবে কম্পিত হৃদয়ে অপেক্ষা করছ তুমি? আমার শিক্ষা আরম্ভ হওয়ার আগে আমি ছিলাম ঐ জাহাজটার মতো। শুধু আমার কাছে ছিল না জলের গভীরতা মাপার জন্য কোনো ওলন দড়ি অথবা কম্পাস। আর এজন্যই আমি বন্দর থেকে কত দূরে রয়েছি তা জানার উপায় ছিল না আমার। 'আলো! আমাকে আলো দাও!' বলে আমার অন্তরাত্মা শব্দহীন ভাষায় কেঁদেছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে ভালোবাসার আলো আমার ওপর এসে পড়েছিল।

আমি কারও এগিয়ে আসার পায়ের শব্দ অনুভব করলাম, আমার মা আসছেন ভেবে আমি তাঁর দিকে আমার হাত বাড়িয়ে দিলাম। কেউ একজন আমার হাতটা টেনে নিলেন এবং আমাকে কাছে টেনে তাঁর নিবিড় বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করলেন, যিনি আমার কাছে সব কিছু উদঘাটন করতে এবং তার চেয়েও বড় কথা আমাকে ভালোবাসতে এসেছিলেন।

www.amarboi.org

আমার শিক্ষিকা আসার পরের দিন সকালবেলা তিনি আমাকে তাঁর ঘরের ভিতর নিয়ে গিয়েছিলেন এবং আমাকে একটা পুতুল দিয়েছিলেন। পারকিনস্ ইনসটিটিউশন এর অন্ধ শিশুরা এটা আমাকে পাঠিয়েছিল এবং লরা ব্রিজম্যান একে পোশাক পরিয়ে দিয়েছিলেন। এটা আমি জেনেছিলাম অনেক পরে। আমি সেটা নিয়ে কিছুক্ষণ খেলা করার পর মিস সুলিভান আস্তে আস্তে আমার হাতের উপর পুতুল শব্দটা লিখলেন। আমি সেই মুহূর্তে আঙুলের খেলায় উৎসাহিত হয়ে পড়লাম এবং সেটা অনুকরণ করার চেষ্টা করলাম। যখন আমি বর্ণগুলো সঠিকভাবে লিখতে সক্ষম হয়েছিলাম, তখন শিশুসুলভ আনন্দে এবং গর্বে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম। আমি ছুটে নিচে মায়ের কাছে গিয়ে আমার হাত মায়ের সামনে তুলে ধরে তার ওপর পুতুল লেখার বর্ণগুলো লিখেছিলাম। আমি অবশ্য জানতাম না যে আমি একটা শব্দ লিখেছি অথবা সে শব্দের আদৌ কোনো অস্তিত্ব আছে। আমি বাঁদরের মতো অনুকরণ করে শুধু আঙুল চালিয়েছিলাম। পরের দিনগুলোতে এইভাবে ঠিক না বুঝে অনেক শব্দের বানান করতে শিখেছিলাম, সেগুলোর মধ্যে ছিল পিন, হ্যাট, কাপ এবং কিছু ক্রিয়াপদ, যেমন– সিট, স্ট্যান্ড এবং ওয়াক। কিন্তু আমার শিক্ষিকা বেশ কয়েক সপ্তাহ আমার কাছে থাকার পরে আমি বুঝেছিলাম যে সবকিছুরই একটা করে নাম আছে।

একদিন আমি যখন আমার নতুন পুতুলটা নিয়ে খেলছিলাম, তখন মিস সুলিভান আমার কোলের ওপর আমার ন্যাকড়ার পুতুলটা রাখলেন এবং বানান করলেন 'পুতুল' এবং আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে 'পুতুল' শব্দটা দুটো পুতুলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সে দিনই সকালে 'ম-গ' এবং 'পানি' শব্দ দুটো নিয়ে আমাদের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ তীব্র বাদানুবাদ হয়েছিল। মিস সুলিভান আমাকে বিশেষভাবে বোঝাতে চাইছিলেন যে 'মা-গ' হচ্ছে 'মগ' এবং 'পানি' হচ্ছে 'পানি' কিন্তু আমি নাছোড়বান্দার মতো শব্দ দুটোকে তালগোল পাকিয়ে ফেলছিলাম। হতাশ হয়ে তিনি তখনকার মতো বিষয়টা স্থগিত রেখেছিলেন শুধুমাত্র প্রথম সুযোগেই আবার সেটা উত্থাপন করবেন বলে। তাঁর বারবার চেষ্টায় অধৈর্য হয়ে আমি নতুন পুতুলটা ছিনিয়ে নিলাম এবং ওটাকে মেঝেতে সজোরে আছাড় মারলাম। আমি খুবই উৎফুল্ল হয়েছিলাম যখন পুতুলের ভাঙা টুকরোগুলো আমার পায়ের কাছে অনুভব করতে পেরেছিলাম। আমার এ হঠাৎ করে ফেলা আবেগের কাজটির জন্য দুঃখ বা অনুশোচনা হয়নি। পুতুলটাকে আমি ভালোবাসতাম না। যে স্থির এবং আঁধার জগতে আমি বাস করতাম সেখানে গভীর অনুভূতি বা কোমলতা ছিল না। আমি বুঝতে পেরেছিলাম আমার শিক্ষিকা টুকরোগুলো যে দিকে চুল্লি আছে তার একপাশে ঝাঁট দিয়ে সরিয়ে রাখছেন এবং আমি তৃপ্তি পেয়েছিলাম এই ভেবে যে আমার অস্বস্তির কারণটা অপসারিত হয়েছে। মিস সুলিভান আমাকে টুপি এনে দিলেন এবং আমি বুঝতে পারলাম যে বাইরে সূর্যের উষ্ণ আলোয় আমি বেড়াতে যাচ্ছি। এই চিন্তা, এই শব্দহীন অনুভূতিকে যদি চিন্তা বলে মনে করা যায়, সেই চিন্তার আনন্দে আমি লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে লাগলাম।

www.amarboi.org

আমরা কুয়োঘরে যাওয়ার পথ দিয়েই হেঁটে যেতে থাকি। কুয়োঘরটা হানিসাকেল নামের লতানো সুগন্ধি ফুলে আচ্ছাদিত ছিল। তার গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কেউ একজন কুয়ো থেকে জল তুলছিল এবং আমার শিক্ষিকা আমার হাতটা জল বের হওয়ার নলের তলায় রাখলেন। আমার এক হাতে যখন শীতল জলধারা বয়ে যাচ্ছিল, তখন পানির কল থেকে পানি পড়ছিল। প্রথমে আস্তে এবং তারপর দ্রুততার সাথে পানি শব্দটা আমার অপর হাতে লিখলেন। আমি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকলাম আর আমার মনোযোগ তাঁর আঙুল নাড়াচাড়ার দিক নিবদ্ধ ছিল। হঠাৎ একটা অস্পষ্ট চেতনাবোধ অনুভব করলাম যা আমি ভুলে গিয়েছিলাম– পিছনে ফেলে আসা চেতনাকে ফিরে পাওয়ার আনন্দ আমাকে মোহিত করল এবং যেভাবেই হোক ভাষার রহস্যটা আমার কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়ল। আমি তখন জানলাম যে 'পা-নি' বলতে বোঝায় সেই আশ্চর্যজনক ঠাণ্ডা জিনিস যা আমার হাতের উপর পড়ছে। সেই জীবন্ত শব্দটি আমার অন্তরাত্মাকে জাগিয়ে তুলল, তাকে আলো দিল, দিল আশা, দিল আনন্দ, আর দিল বন্দিদশা থেকে মুক্তি। তখনও অনেক বাধার বেড়া ছিল এটা সত্যি, কিন্তু সেই বাধাগুলো ঠিকসময়ে সরে যাওয়ার সম্ভাবনাও ছিল।

জানার আগ্রহ নিয়ে আমি কুয়োঘর ছাড়লাম। প্রত্যেক জিনিসের একটা করে নাম ছিল এবং প্রত্যেকটা নাম একটা করে নতুন চিন্তার জন্ম দিল। আমরা বাড়ি ফেরার পর সে দিন যা কিছু স্পর্শ করেছিলাম মনে হয়েছিল তার মধ্যে একটা প্রাণের স্পন্দন রয়েছে। এরকম বোধ হয়েছিল কারণ তখন আমি সব জিনিসই এক অদ্ভুত নতুন দৃষ্টিতে দেখেছিলাম, যা আমি অর্জন করেছিলাম। ঘরে ঢুকেই আমার মনে পড়ে গেল সেই পুতুলটার কথা যেটা আমি ভেঙেছিলাম। আমি চুল্লির পথটা অনুভব করে যেখানে টুকরোগুলো পড়ে ছিল সেখানে গেলাম এবং টুকরোগুলো তুলে জোড়া দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম। এরপর আমার চোখ অশ্রুতে ভরে গেল; কারণ আমি বুঝতে পেরেছিলাম আমি কী করেছি এবং জীবনে সেই প্রথমবার আমি অনুভব করেছিলাম অনুতাপ এবং দুঃখ।

সেদিন আমি প্রচুর নতুন শব্দ শিখেছিলাম। আমি মনে করতে পারছি না সেই শব্দগুলো কী কী ছিল; কিন্তু এটা মনে আছে যে সেই শব্দগুলোর মধ্যে মা, বাবা, বোন, শিক্ষক ছিল– যে শব্দগুলো ভবিষ্যতে আমার জন্য জগৎকে বিকশিত করবে 'আরনের পুষ্পিত ডালের মতো'। সেই ঘটনাবহুল দিনের শেষে যখন শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট বিছানায় শুলাম তখন আমার চেয়ে আনন্দিত শিশু আর কেউ ছিল না এবং যে আনন্দ সেই দিনটা আমায় দিয়েছিল তাই নিয়ে বেঁচে রইলাম। সেই প্রথম আমি একটা নতুন সকাল আসার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করেছিলাম।

www.amarboi.org

পাঁচ

১৮৮৭ সালের গ্রীষ্মকালের বহু ঘটনা আমি মনে করতে পারি, যেগুলো আমার অন্তরাত্মা জেগে ওঠার পর হঠাৎ ঘটেছিল। আমি হাত বাড়িয়ে প্রত্যেকটি বস্তু স্পর্শ করতাম এবং তাদের নাম শিখে নিতাম। এইভাবে যত বেশি জিনিস আমি স্পর্শ করতাম সাথে সাথে তাদের নাম এবং ব্যবহার শিখতে পারতাম, ততই আমার মধ্যে আনন্দ ও আত্মবিশ্বাস জেগে উঠতো আর সাথে সাথে অনুভব করতাম বাকি পৃথিবীর সাথে নিজের আত্মীয়তা।

তারপর যখন ডেইজি এবং সোনালি বর্ণের ঝুমকো ফুল ফোটার সময় এলো তখন মিস সুলিভান আমাকে হাত ধরে ধীরে ধীরে মাঠে নিয়ে যেতেন যেখানে চাষীরা বীজ বোনার জন্য মাটি তৈরি করছিল। তারপর মাঠ পেরিয়ে টেনেসি নদীর পারে নিয়ে যেতেন। ওখানে উষ্ণতায় ভরা ঘাসের ওপর বসে প্রকৃতির দান সম্পর্কে তাঁর কাছ থেকে প্রথম পাঠ নিয়েছিলাম। আমি জেনেছিলাম সূর্যকিরণ এবং বৃষ্টি প্রতিটি গাছকে কীভাবে মাটি থেকে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে, যে গাছগুলো দেখতে সুন্দর আর সুখাদ্য। আরো জেনেছিলাম পাখিরা কীভাবে তাদের বাসা বানায়, উড়ে যায় দেশ থেকে দেশান্তরে, তারা কীভাবে বাঁচে, সতেজ থাকে। জেনেছিলাম কীভাবে কাঠবিড়ালী, হরিণ, সিংহ এবং অন্যান্য প্রাণীরা খাদ্য খুঁজে নেয়, আশ্রয়ের বন্দোবস্ত করে। জগতের বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কে আমার জ্ঞান যতই বাড়তে লাগল, ততই আমার জগত আরো আনন্দময় হয়ে উঠল। পাটিগণিতের অঙ্ক অথবা পৃথিবীর আকৃতি বর্ণনা শেখার অনেক আগেই মিস সুলিভান আমাকে সুগন্ধি বৃক্ষরাজির সৌন্দর্য চিনতে শিখিয়েছিলেন। শিখিয়েছিলেন প্রতিটি ঘাসের ছুঁচোলো পাতার অবয়ব আর আমার ছোট বোনের হাতের টোল এবং বক্ররেখাগুলোর সৌন্দর্য। তিনি আমার শিশু বয়সের চিন্তাধারাকে প্রকৃতির সাথে যুক্ত করেছিলেন এবং আমাকে অনুভব করতে শিখিয়েছিলেন যে, 'পাখি, ফুল এবং আমি একে অপরের সঙ্গী'।

কিন্তু এ সময়ই আমার একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এই অভিজ্ঞতা আমাকে শিক্ষা দিয়েছিল যে প্রকৃতি সবসময়ই করুণাময়ী নয়। একদিন আমি এবং আমার শিক্ষিকা দীর্ঘপথে খেয়ালখুশি মতো ঘুরে বেড়ালাম। সে দিনের সকালবেলাটা ছিল বেশ সুন্দর। কিন্তু বেলা বাড়ার সাথে সাথে বাড়তে থাকে গরম ও গুমোটভাব। তাই শেষ পর্যন্ত আমরা বাড়ি ফেরার পথ ধরি। দু-তিনবার আমরা পথের ধারে গাছের তলায় বিশ্রাম নেওয়ার জন্য থেমেছিলাম। শেষ থামার স্থান ছিল আমাদের বাড়ির অদূরে একটি বুনো চেরিগাছের তলা। গাছের ছায়া ছিল মনোরম এবং গাছটায় চড়া ছিল বেশ সহজ। আমি আমার শিক্ষিকার সাহায্য নিয়ে গাছটিতে চড়ে একটা ডালের ওপর বসেছিলাম। গাছের ডালের ওপরটা এত শীতল ছিল যে, মিস সুলিভান

www.amarboi.org

সেখানেই দুপুরের খাবার খাওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন। আমি তাঁকে কথা দিয়েছিলাম যে তিনি যতক্ষণ না বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে ফিরে আসবেন ততক্ষণ আমি ওখানে শান্তভাবে বসে থাকব।

হঠাৎ গাছের ওপর দিয়ে একটা পরিবর্তন ঘটে গেল। সূর্যের তাপ নিঃশেষ হয়ে গেল। আমি বুঝতে পারলাম যে আকাশটা কালো হয়ে গেছে। কেননা সূর্যের সমস্ত তাপ, আমার কাছে যার অর্থ ছিল আলো, তা বায়ুমণ্ডল থেকে মুছে গেছে। একটা অদ্ভুত গন্ধ আসছিল মাটি থেকে। আমি জানতাম যে, এটা সেই গন্ধ যা বজ্রবিদ্যুৎপূর্ণ ঝড়-বৃষ্টির আগে পাওয়া যায় একটা অজানা ভয় আমার হৃদয়কে আঁকড়ে ধরল। আমি সম্পূর্ণ একা। একাকীত্ববোধ আমাকে আচ্ছন্ন করল। নিজেকে বন্ধু-বান্ধব ও কঠিন মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হলো। একটা গভীর এবং অজানা ভীতি আমাকে ঘিরে ধরল। আমি স্থির এবং অজানা আশঙ্কায় সেখানে বসে থাকলাম, আর একটি হিমশীতল আতঙ্ক আমার ওপর গুটি গুটি এসে হাজির হলো। আমার শিক্ষিকা ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকলাম আকুল আগ্রহে। সেই সাথে গাছ থেকে নামার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা ভেতরে ভেতরে কাজ করছিল।

এক মুহূর্তের এক ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা, তারপর গাছের পাতাগুলোর মধ্যে অসংখ্য আলোড়ন দেখা দিল। একটা কম্পন গাছের মধ্যে দিয়ে দ্রুত গতিতে প্রবাহিত হলো, এবং বাতাসে একটা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটল যা আমাকে গাছ থেকে ফেলে দিত। আমি ডালটাকে সর্বশক্তি দিয়ে আঁকড়ে না ধরলে আমাকে সত্যিই ফেলে দিত। গাছটা আন্দোলিত হচ্ছিল এবং প্রসারিত হচ্ছিল। ছোট ছোট ডালপালাগুলো আমার আশপাশে বৃষ্টিধারার মতো ঝরে পড়ছিল। গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ার একটা প্রচণ্ড আবেগ আমাকে পেয়ে বসেছিল, কিন্তু আতঙ্ক আমাকে আটকে রেখেছিল। আমি গাছের ডাল ধরে খানিকটা নেমে এলাম। গাছের ডালগুলো এসে যেন আমাকে চাবুক মারছিল। মাঝে মধ্যে আমি একটা ভয়ঙ্কর ঝাঁকুনি অনুভব করছিলাম। মনে হচ্ছিল, যেন কোনও একটা ভারী জিনিস গাছটার ওপর আছড়ে পড়েছে, সেই কম্পন ছড়িয়ে পড়ল ও অবশেষে যে ডালটায় বসেছিলাম তার কাছে এসে পৌঁছোল। মনে হচ্ছিল আমি হতবুদ্ধির শেষ সীমানায় পৌঁছে গেছি এবং ঠিক যখন ভাবছিলাম যে গাছ এবং আমি একসাথেই মাটিতে আছড়ে পড়ব, ঠিক সেই সময় আমার শিক্ষিকা আমার হাত ধরলেন এবং আমাকে নামতে সাহায্য করলেন। আমি তাঁকে আঁকড়ে ধরলাম এবং আনন্দে কম্পিত, শিহরিত হলাম আর অনুভব করলাম যে আমি আবার পৃথিবীর মাটিতে পা রাখতে পেরেছি। সেদিন আমি একটা নতুন শিক্ষা পেলাম– প্রকৃতি তার সন্তানদের বিরুদ্ধে খোলাখুলিভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং সবচেয়ে নরম স্পর্শের মধ্যেও লুকিয়ে রাখে তার বিশ্বাসঘাতী নখ।

এই অভিজ্ঞতার পর অনেক দিন আমি অন্য কোনো গাছে উঠিনি। কেননা শুধুমাত্র গাছে চড়ার চিন্তা আমাকে আতঙ্কিত করত। শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত ফুলেভরা লজ্জাবতী গাছের মধুর আকর্ষণে আমি এই ভয় কাটিয়ে উঠেছিলাম। এক

www.amarboi.org

সুন্দর বসন্তের সকালে আমি যখন বাগানে আমাদের গ্রীষ্মকালীন বাড়িতে বসে একাকী পড়ছিলাম, তখন বাতাসে অপূর্ব মৃদু গন্ধের আভাস পেলাম। হঠাৎ উঠে পড়লাম এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাত বাড়িয়ে দিলাম। মনে হলো– বসন্তের প্রাণসত্তা গ্রীষ্মাবাসটির মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এটা কী?' পরমুহূর্তেই আমি ওটাকে প্রস্ফুটিত লজ্জাবতী ফুলের গন্ধ বলে চিনতে পারলাম। আমি ঐ গন্ধ অনুভব করে বাগানের শেষ প্রান্তে পৌঁছলাম। আমার তখন মনে হচ্ছিল যেখানে পথটা বাঁক নিয়েছে সে বেড়ার কাছেই রয়েছে লজ্জাবতী গাছটা। হাঁ, ওটা ওখানেই ছিল এবং রোদের উষ্ণতায় কাঁপছিল, আর ফুলের ভারে ওর শাখা-প্রশাখাগুলো প্রায় লম্বা লম্বা ঘাস স্পর্শ করছিল। এর আগে এমন অপূর্ব সুন্দর জিনিস পৃথিবীতে কখনও ছিল কি! এই ফুলের কোমল পাপড়িগুলো পার্থিব কোনো কিছুর সামান্য স্পর্শে কুঁকড়ে যায়। মনে হয় স্বর্গের কোনো গাছ যেন কেউ তুলে এনে পৃথিবীতে বসিয়ে দিয়েছে। আমি ফুলের পাপড়িগুচ্ছের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গাছের বিশাল গুঁড়িটার কাছে পৌঁছে মিনিট খানেক দ্বিধান্বিতভাবে দাঁড়িয়ে থাকলাম এবং তারপর দুটি ডালের ফাঁকে চওড়া জায়গায় পা রেখে গাছের ওপরে উঠে গেলাম। গাছের ডালগুলো ছিল খুব মোটা এবং বাকল ছিল খুব শক্ত। ফলে গাছের ডাল ধরতে আমার অসুবিধা হচ্ছিল। কিন্তু আমার একটা চমৎকার অনুভূতি হচ্ছিল যে আমি একটা অস্বাভাবিক এবং অপূর্ব কিছু করছিলাম। ঐ অনুভূতিতে আমি গাছের ওপরে, আরো ওপরে চড়তে থাকলাম যতক্ষণ না একটা ছোট্ট বসার জায়গায় পৌঁছলাম যেটা কেউ একজন অনেকদিন আগে ওখানে বানিয়েছিল আর ওটা গাছের একটা অংশই হয়ে গিয়েছিল। আমি ওখানে অনেকক্ষণ বসেছিলাম এবং গোলাপি মেঘের ওপরে বসে থাকা পরীদের মতো নিজেকে অনুভব করেছিলাম। এরপর থেকে আমি সুন্দর চিন্তা করে ও উজ্জ্বল স্বপ্ন দেখে অনেক মধুর সময় স্বর্গীয় গাছটির ওপর কাটিয়েছিলাম।

www.amarboi.org

ছয়

এই সময় আমার কাছে ভাষা শেখার চাবিকাঠি ছিল এবং কীভাবে সেটা ব্যবহার করা যায় তা জানতে উৎসুক ছিলাম। যে শিশুরা কানে শুনতে পায় তারা ভাষা আয়ত্ত করে কোনো বিশেষ প্রচেষ্টা ছাড়াই। অপরের ঠোঁট থেকে ঝরে পড়া শব্দ তারা সানন্দে দ্রুত লুফে নেয়। অন্যদিকে একটি ছোট বধির শিশু শব্দগুলোকে জানে খুব ধীরে ধীরে এবং প্রায়ই যন্ত্রণাদায়ক পদ্ধতিতে। তবে পদ্ধতি যাই হোক না কেন, এর ফল কিন্তু বিস্ময়কর। একটা বস্তুর নামকরণ থেকে শুরু করে, আমরা ধাপে ধাপে অতিক্রম করি একটা বিশাল দূরত্ব। আমাদের প্রথম তোতলানো শব্দাংশ থেকে শেক্সপিয়রের লেখা লাইনের গভীর তাৎপর্য পর্যন্ত বিস্ময়কর।

প্রথম প্রথম যখন আমার শিক্ষিকা কোনো একটা নতুন জিনিস সম্বন্ধে বলতেন, তখন আমি তাঁকে খুব কম প্রশ্ন করতাম। তখন আমার ধারণা ছিল অস্পষ্ট এবং আমার শব্দভাণ্ডারও ছিল সীমিত। কিন্তু নানা জিনিস সম্বন্ধে আমার জ্ঞান যত বৃদ্ধি পেতে থাকল, আমি অনেক অনেক শব্দ শিখলাম, আমার প্রশ্ন করার পরিধি বেড়ে গেল এবং আরও জানার জন্য আমি বারবার একই বিষয়ে ফিরে আসতে থাকলাম। কখনও কখনও কোনো একটা নতুন শব্দ আবার মুছে দিত অন্য কোনো শব্দ, যা আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা মস্তিষ্কে খোদাই করে রেখেছিল।

আমার মনে আছে সেই সকালের কথা যেদিন আমি প্রথম জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'ভালোবাসা' কথাটার অর্থ কী। এই ব্যাপারটা ঘটেছিল আমি বেশি শব্দ জানার আগেই। আমি বাগানে সদ্যফোটা ভায়োলেট ফুল দেখতে পেয়ে সেগুলো আমার শিক্ষিকার কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি আমাকে চুমু দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সে সময় মা ছাড়া কেউ আমাকে চুমু দিক, তা আমি পছন্দ করতাম না। মিস সুলিভান আলতো করে আমাকে জড়িয়ে আমার হাতে লিখলেন 'আমি হেলেনকে ভালোবাসি।'

'ভালোবাসা কী?' আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি আমাকে তাঁর আরো কাছে টেনে নিলেন এবং বললেন, 'এটা এখানে', এই বলে তিনি আমার বুকের ওপর হাত রাখলেন। এই প্রথম আমি আমার বুকের স্পন্দন অনুভব করলাম। তাঁর কথাগুলো আমাকে অত্যন্ত বিহ্বল করে দিয়েছিল, কেননা তখন আমি কোনো বস্তুকেই স্পর্শ না করে বুঝতে পারতাম না।

আমি তাঁর হাতে থাকা ভায়োলেট ফুলটা শুঁকলাম, এবং অর্ধেকটা কথায় অর্ধেকটা ইশারায় প্রশ্ন করলাম, 'ভালোবাসা কি ফুলের মিষ্টি গন্ধ?'

আমার শিক্ষিকা বললেন, 'না।'

আমি আবার ভাবলাম। উষ্ণ সূর্য আমাদের আলো দিচ্ছিল।

www.amarboi.org

'এটা কি ভালোবাসা নয়?' যে দিক থেকে উষ্ণতা আসছিল সেদিকে নির্দেশ করে জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কি ভালোবাসা নয়?'

আমার মনে হয়েছিল সূর্যের চেয়ে সুন্দর আর কিছুই হতে পারে না, যার উষ্ণতা সব জিনিসকে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে। কিন্তু মিস সুলিভান মাথা নাড়লেন, এতে আমি বিহ্বল এবং নিরাশ হলাম। ব্যাপারটা আমার কাছে খুব অদ্ভুত বলে মনে হলো যে, আমার শিক্ষিকা আমাকে ভালোবাসা বস্তুটা কী তা দেখাতে পারছেন না।

এই ঘটনার একদিন দুদিন পরে একটা নির্দিষ্ট ভাগ বা ভারসাম্য মেনে আমি বিভিন্ন আকারের পুঁতি দিয়ে মালা গাঁথছিলাম– দুটো বড় পুঁতি তারপর তিনটে ছোট পুঁতি এভাবে। এটা করতে গিয়ে আমি অনেক ভুল করেছিলাম এবং মিস সুলিভান বারবার ধৈর্য নিয়ে সেই ভুলগুলো দেখিয়ে দিচ্ছিলেন। শেষে আমি একটা নিশ্চিত ভুল দেখতে পেলাম পুঁতিগুলো সাজানোর ক্রমে এবং কিছুক্ষণের জন্য আমি আমার মনোযোগ সংহত করলাম। মিস সুলিভান যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তার ওপর এবং আমি ভাবতে চেষ্টা করলাম কীভাবে পুঁতিগুলো সাজানো উচিত ছিল। মিস সুলিভান আমার কপাল স্পর্শ করলেন এবং স্পষ্ট জোরের সাথে বানান করে লিখলেন, 'চিন্তা কর।'

হঠাৎ আমি বুঝতে পারলাম যে, 'চিন্তা করা' শব্দটা সেই প্রক্রিয়ারই নাম যা সেই সময় আমার মাথার মধ্যে ঘটে চলেছিল। এটাই ছিল আমার প্রথম সচেতনভাবে কোনো একটা বিমূর্ত কিছু সম্পর্কে ধারণা করা।

অনেকক্ষণ ধরে আমি স্থির হয়ে ছিলাম– তখন আমি আমার কোলে থাকা পুঁতিগুলো সম্বন্ধে চিন্তা করছিলাম না, চেষ্টা করছিলাম নতুন আলোকে 'ভালোবাসা' শব্দটির অর্থ বোঝার। সেদিন সারাদিনই সূর্য মেঘের আড়ালে ছিল, কিছুক্ষণ বৃষ্টিও পড়েছিল। কিন্তু হঠাৎ সূর্য প্রকাশ পেল তার দক্ষিণী উজ্জ্বলতা নিয়ে।

আবার আমি আমার শিক্ষিকাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এটা কি ভালোবাসা নয়?'

'ভালোবাসা হচ্ছে খানিকটা সেই মেঘের মতো যা সূর্য উঠার আগে আকাশে ছিল,' উত্তর দিলেন আমার শিক্ষিকা। তারপর তিনি আরও সহজভাবে সেটা ব্যাখ্যা করেছিলেন, যা সেই সময় আমি বুঝতে পারিনি। তিনি ব্যাখ্যা করলেন, 'তুমি মেঘেদের স্পর্শ করতে পার না, তাদের তুমি বুঝতে পার। কিন্তু তুমি বৃষ্টিকে অনুভব করতে পার এবং তুমি জান, একটা উষ্ণ দিনের পর বৃষ্টি পেয়ে ফুলেরা এবং তৃষ্ণার্ত ধরা কী আনন্দই না পায়! তুমি ভালোবাসাকেও স্পর্শ করতে পার না; কিন্তু তুমি অবশ্যই মাধুর্য ঢেলে দেয়া সমস্ত বস্তুকে ভালোবাস এবং তা অনুভব করতে পার। ভালোবাসা ছাড়া তুমি সুখী হতে পারবে না বা তোমার খেলার ইচ্ছাও হবে না।'

এক অপূর্ব সত্য আমার মনে সহসা উপস্থিত হলো– আমি উপলব্ধি করলাম আমার এবং অন্যদের আত্মার মধ্যে প্রসারিত হয়ে আছে কিছু অদৃশ্য সরলরেখা। অর্থাৎ সকলের মধ্যে এক অদৃশ্য যোগসূত্র বর্তমান।

www.amarboi.org

আমার শিক্ষার প্রথম থেকেই মিস সুলিভান একটা নিয়ম করে নিয়েছিলেন যে, একটা কানে শুনতে পাওয়া শিশুর সাথে যেভাবে কথা বলা হয় আমার সাথেও সেইভাবেই কথা বলবেন। শুধু তফাতটা ছিল এই যে তিনি কথা বলার বদলে বাক্যগুলো বানান করে আমার হাতে লিখে দিতেন। চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ করার মতো প্রয়োজনীয় শব্দ এবং বাগধারা আমার জানা না থাকলে তিনি সেগুলোর জোগান দিতেন অর্থাৎ বলে দিতেন। এমনকি আমি কথোপকথনের অংশের খেই হারিয়ে ফেললে আমার কী করা উচিত তাও বলে দিতেন।

এই পদ্ধতিটি চলেছিল বেশ কয়েক বছর ধরে; কারণ বধির শিশু নিত্যদিনের আলাপচারিতায় ব্যবহৃত অসংখ্য বাগধারা ও বাক্যাবলি এক মাসে এমনকি দু-তিন বছরেও শেখে না। বধির শিশু শেখে প্রতিনিয়ত পুনরাবৃত্তি আর অনুকরণের মাধ্যমে। শ্রবণশক্তিসম্পন্ন শিশুরা তাদের বাড়িতে যা কথাবার্তা শোনে, তা তাদের মনকে উদ্দীপ্ত করে এবং তাদের বিষয়ের ইঙ্গিত দেয় এবং তাদের চিন্তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটে। চিন্তার এই স্বাভাবিক আদান-প্রদান থেকে বধির শিশুটি বঞ্চিত। এই ব্যাপারটা আমার শিক্ষিকা বুঝতে পেরে আমার মধ্যে যে উদ্দীপকের অভাব আছে, তা সরবরাহ করতে অর্থাৎ পূরণ করতে কৃতসংকল্প ছিলেন। এটা তিনি করতেন যা কিছু তিনি শুনতেন সেইসব শব্দের যতদূর সম্ভব অবিকল পুনরাবৃত্তি করে এবং আমি কীভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারি তা আমাকে দেখিয়ে দিয়ে। কিন্তু এ ব্যাপারে সাহস সঞ্চয় করে প্রথম প্রচেষ্টা শুরু করতেই আমার দীর্ঘ সময় লেগে গিয়েছিল। এবং ঠিক সময়ে ঠিক কথা খুঁজে বলতে আমার আরো অনেক বেশি সময় লেগেছিল।

একজন অন্ধ অথবা বধিরের পক্ষে কথোপকথনের সুবিধাগুলো অর্জন করা খুবই কঠিন। যারা একই সাথে বধির এবং অন্ধ, তাদের ক্ষেত্রে এই অসুবিধাটা কতই না বেড়ে যায়! তারা কণ্ঠস্বরের ধ্বনির বৈশিষ্ট্য পৃথক করতে পারে না অথবা অপরের সাহায্য ছাড়া তারা স্বরগ্রামের উঁচু-নিচু চলন– যা শব্দকে বৈশিষ্ট্য দান করে, তাকে ধরতে পারে না। তারা দেখতেও পায় না কোনো বক্তার মুখের অভিব্যক্তি, এবং কোনো চাহনি যা প্রায়ই বক্তার কথার আত্মস্বরূপ।

www.amarboi.org

সাত

আমার শিক্ষার পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ধাপ ছিল পড়তে শেখান।

যখন আমি কিছু শব্দ বানান করতে শিখলাম, আমার শিক্ষিকা আমাকে কয়েকটা কার্ডবোর্ডের টুকরো দিলেন। ওগুলোর ওপর উঁচু উঁচু ছাপ দেয়া শব্দ লেখা ছিল। আমি খুব তাড়াতাড়ি শিখে নিলাম শব্দগুলো। প্রতিটি ছাপানো শব্দ কোনো একটা জিনিস, কোনো কাজ অথবা গুণকে বোঝায়। আমার একটা ফ্রেম ছিল, যাতে আমি শব্দগুলোকে ছোট ছোট বাক্যে সাজিয়ে রাখতে পারতাম। কিন্তু বাক্যগুলোকে ফ্রেমে রাখার আগে বস্তুর সাহায্যে তৈরি করতাম। আমি কার্ডবোর্ডের ওপর লেখা উঁচু উঁচু হরফগুলোর মধ্য থেকে শব্দগুলো বেছে নিতাম, যেমন, 'পুতুল', 'রয়েছে', 'ওপরে', 'বিছানার' এবং সেগুলো যে জিনিস বোঝায় তার ওপর রাখতাম; তারপর আমি আমার পুতুলটিকে বিছানার ওপর রেখে তার পাশে 'পুতুল', 'বিছানার', 'ওপর', 'রয়েছে' শব্দগুলো পরপর সাজিয়ে রাখতাম আর একই সাথে বস্তুগুলোর সাহায্যে বাক্যের ধারণা ফুটিয়ে তুলতাম।

একদিন আমি 'মেয়ে' শব্দটি আমার পোশাকের ওপর পরে থাকা ঢিলে আঙরাখার ওপর পিন দিয়ে আটকে আলমারির ভেতর রেখেছিলাম। তাকের ওপর 'হয়', 'আলমারি' 'ভেতর' শব্দগুলো সাজিয়ে রেখেছিলাম। কোনো কিছুই এই খেলার থেকে বেশি আনন্দ দিত না আমাকে। আমি এবং আমার শিক্ষিকা এই খেলাটা ঘণ্টার পর ঘণ্টা খেলতাম। প্রায়ই ঘরের সব বস্তু-বাক্য হিসাবে সাজিয়ে রাখতাম।

উঁচু উঁচু হরফে ছাপা পিচবোর্ডের টুকরোগুলো ছিল ছাপা বইতে পৌঁছানোর শুধু একটা ধাপ। আমি আমার 'রিডার ফর বিগিনারস' বইটা নিয়ে যে শব্দগুলো আমার জানা ছিল সেগুলো খুঁজতাম। যখন আমি সেই শব্দগুলো খুঁজে পেতাম তখন লুকোচুরি খেলার মতো আনন্দ পেতাম। এইভাবে আমি পড়তে শিখেছিলাম। সেই সময় আমি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কাহিনীগুলো পড়তে আরম্ভ করেছিলাম। এর কথা পরে বলবো।

অনেকদিন পর্যন্ত আমার কোনো নিয়মিত পাঠ্যসূচি ছিল না। এমনকি যখন আমি খুব একাগ্রতার সাথে পড়াশুনা করতাম, তখন সেটাকে আমার কাজের চেয়ে বেশি খেলা বলে মনে হতো। মিস সুলিভান যা কিছু আমাকে শেখাতেন, সুন্দর গল্প অথবা কবিতার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে বোঝাতেন। যখনই কোনো কিছু আমাকে আনন্দ দিত অথবা আমার আকর্ষণীয় বলে মনে হতো, তিনি সেই বিষয়টা নিয়ে এমনভাবে কথা বলতেন যেন তিনি নিজেই একটি ছোট্ট মেয়ে। অনেক শিশু ভয়ের সাথে এবং যে যন্ত্রণার সাথে ব্যাকরণ, কঠিন অঙ্ক এবং তার চেয়েও বেশি শক্ত সংজ্ঞা আয়ত্ত করে, তা আজ আমার কাছে সবচেয়ে মহার্ঘ হয়ে আছে।

www.amarboi.org

আমার আনন্দ এবং ইচ্ছার প্রতি মিস সুলিভানের যে কী অদ্ভুত সহানুভূতি ছিল তা আমি ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারবো না। সম্ভবত তাঁর দীর্ঘকাল অন্ধদের সাথে থাকার ফল ছিল এটা। এর সাথে যোগ করা যেতে পারে, তাঁর কোনো কিছু বর্ণনা করার বিস্ময়কর ক্ষমতা। তিনি নিরস বর্ণনার প্রসঙ্গ ডিঙিয়ে যেতেন খুব দ্রুততার সাথে এবং কখনই গত পরশুর পড়া আমার মনে আছে কি না তা জানার জন্য প্রশ্ন করে জ্বালাতন করতেন না। তিনি নিরস বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো এমন বাস্তবসম্মতভাবে অল্প অল্প পরিমাণে উপস্থাপন করতেন যে, যা শেখাতেন আমি তা মনে না রেখে পারতাম না।

আমরা বাড়ির বাইরে পড়াশুনা করতাম এবং গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করতাম। কারণ আমরা বাড়ির চেয়ে সূর্যালোকে আলোকিত বন বেশি পছন্দ করতাম। আমার শৈশবের সব পাঠে তাই গাছপালার শ্বাসপ্রশ্বাস মিশে রয়েছে– পাইন গাছের সূঁচের মতো আকার বিশিষ্ট পাতার গন্ধ আর বুনো আঙুরের গন্ধ তাতে জড়িয়ে রয়েছে। একটা বন্য টিউলিপ গাছের সহৃদয় ছায়ায় বসে আমি চিন্তা করতে শিখেছিলাম যে প্রত্যেক জিনিসের মধ্যেই রয়েছে শেখার বিষয় এবং একটা পরামর্শ। সব জিনিসের মাধুর্য আমাকে শিখিয়েছে তাদের উপযোগিতা। নিশ্চিতভাবেই যারা কর্মব্যস্ত থাকে, গুনগুন করে গান করে অথবা ফোটে, তা সবই ছিল আমার শিক্ষার অঙ্গ– আবার ঘ্যাঙরঘ্যাঙর করা ব্যাঙ, বড় গঙ্গাফড়িং এবং ঝিঁঝিঁ পোকা– যতক্ষণ না তারা তাদের কষ্টের কথা ভুলে গিয়ে কাঁপা কাঁপা স্বরে আওয়াজ করত, তাদের ধরে রাখতাম, নরম পালকের মুরগির ছানা, বুনো ফুল, 'ডগউড' ফুলের কুঁড়ি, তৃণভূমির ভায়োলেট ফুল, মুকুলিত ফলের গাছ, সবই ছিল আমার শিক্ষার অংশ। আমি ফেটে যাওয়া কার্পাস ফল স্পর্শ করেছিলাম, নাড়াচাড়া করেছিলাম তার নরম তুলো আর মিহি আঁশওয়ালা বীজগুলো। আমি অনুভব করেছিলাম শস্যমঞ্জরীর মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাসের শিস-এর অনুরূপ ধ্বনি, আর লম্বা পাতাগুলোর মৃদু ঝিরঝির শব্দ, এবং চারণভূমি থেকে ধরে আনা টাট্টু ঘোড়ার মুখে লাগাম পরানোর পর তার ক্রুদ্ধ হ্রেষাধ্বনি। আহা! তার নিশ্বাসের মধ্যে পাওয়া মশলা ও লবঙ্গ-গন্ধ আজও আমার মনে জেগে আছে।

কখনও কখনও আমি ভোরে ঘুম থেকে উঠে চুপিসারে বাগানে চলে যেতাম। তখন ঘন কুয়াশা পড়ে থাকতো ফুলের ওপর আর ঘাসের ডগায়। খুব কম মানুষই জানে হাতের ওপর রাখা গোলাপের নরম স্পর্শ অথবা ভোরের বাতাসে দুলতে থাকা পদ্মফুল কী আনন্দ দেয়। কখনও কখনও ফুল তোলার সময় যে ফুলটা তুলতাম, তার ওপরে থাকা পতঙ্গটি ধরতাম, এবং তার ডানা ঘষার মৃদু শব্দ অনুভব করতাম। কারণ ওটা বাইরের চাপের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে পড়ত।

আমার বারবার যাতায়াতের আর একটা জায়গা ছিল ফলের বাগান। ওখানে জুলাই মাসে ফল পাকত। বড় পালকের মতো নরম পাকা পীচ ফলগুলো আমার হাতের নাগালে চলে আসত। যখন আনন্দিত বাতাস বইত গাছের ওপর দিয়ে, তখন

www.amarboi.org

আপেলগুলো আমার পায়ের কাছে গড়িয়ে পড়ত। আহা! যখন আমি পোশাকের ওপর পরা আঙরাখাটার ওপর ফলগুলো জড়ো করতাম, কী আনন্দ যে হতো! তারপর আপেলগুলোর মসৃণ গালে আমার মুখ চেপে ধরতাম। রোদের তাপে তখনও আপেলগুলো উষ্ণ থাকত। এরপর আমি লাফাতে লাফাতে বাড়ি ফিরে আসতাম।

আমাদের বেড়ানোর আর একটা প্রিয় জায়গা ছিল 'কেলার ল্যান্ডিং'। এই জায়গাটি ছিল জরাজীর্ণ যেনতেনভাবে চেরাই করা কাঠ দিয়ে বানানো মাল বোঝাই এবং খালাস করার একটা ঘাট। এই ঘাটটা ছিল টেনেসি নদীর পারে এবং এটা ব্যবহার করা হতো গৃহযুদ্ধের সময় সৈন্যদের ওঠা-নামা করার জন্য। সেখানে আমরা অনেক আনন্দের সময় কাটিয়েছিলাম এবং খেলার ছলে ভূগোল শিখেছিলাম। আমি নুড়ি পাথরের বাঁধ, দ্বীপ এবং হ্রদ বানিয়েছিলাম এবং নদীর খাত খুঁড়েছিলাম। আর এসবই করেছিলাম মজা করে এবং কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি যে আমি কোনো পাঠ শিখছিলাম। আমি অবাক বিস্ময়ে শুনতাম মিস সুলিভানের দেওয়া এই বিশাল পৃথিবীর গোল আকৃতির বর্ণনা, এর জ্বলন্ত পর্বতের কথা, মাটির তলায় চাপা পড়া নগরীর কথা, চলমান বরফের নদী এবং আরো অনেক এইরকম আশ্চর্য জিনিসের কথা। তিনি মাটি দিয়ে উঁচু করে মানচিত্র বানাতেন যাতে আমি পর্বতের প্রান্তভাগ ও উপত্যকাকে বুঝতে পারি। আঙুল দিয়ে নদীর আঁকা-বাঁকা পথ অনুসরণ করতে পারি। এটাও আমি পছন্দ করতাম কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল এবং মেরুর বিভাজন আমাকে বিভ্রান্ত করত, উত্যক্ত করত। উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর জন্য তিনি যে কমলা লেবু রং-এর কাঠি ব্যবহার করতেন এবং সুতো ব্যবহার করতেন, সেগুলো আমার কাছে খুবই বাস্তব মনে হতো। এমনকি এখনও শুধু নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল উল্লেখ করা মাত্র কতকগুলো পাকানো দড়ির সারি বাঁধা বৃত্তের কথা মনে পড়ে আমার। আমি বিশ্বাস করি যদি কেউ মানচিত্র তৈরি করতে বসে, তবে সে আমাকে বিশ্বাস করাতে পারবে যে শাদা ভল্লুকেরা সত্যি সত্যিই উত্তর মেরুর ওপর চড়ে থাকে।

মনে হয়– গণিতই ছিল একমাত্র পাঠ্য বিষয় যা আমি পছন্দ করতাম না। প্রথম থেকেই আমি পাটিগণিত পছন্দ করতাম না। মিস সুলিভান আমাকে গুনতে শেখানোর চেষ্টা করতেন সুতোয় গেঁথে রাখা দলবদ্ধ পুঁতির সাহায্যে। তাছাড়া কাঠি সাজিয়ে সাজিয়ে যোগ বিয়োগ করতে শিখেছিলাম। কাঠিগুলোকে পাঁচ অথবা ছয়ের বেশি ভাগে ভাগ করার ধৈর্য আমার ছিল না। যখনই ঐ কাজটা করা হয়ে যেত, তখনই আমি সে দিনের মতো অঙ্ক কষার দায়িত্ব থেকে মুক্তি নিতাম আর বেরিয়ে পড়তাম খেলার সঙ্গী খুঁজতে।

এই রকমই ধীর-স্থিরভাবে আমি প্রাণিবিদ্যা এবং উদ্ভিদবিদ্যা অধ্যয়ন করেছিলাম।

একবার একজন ভদ্রলোক, যাঁর নামটা আমি ভুলে গেছি, তিনি আমাকে অনেকগুলো জীবাশ্মের সংগ্রহ পাঠিয়েছিলেন যার মধ্যে ছিল সুন্দরভাবে চিত্রিত করা

www.amarboi.org

শামুক জাতীয় ছোট্ট প্রাণীর খোল। পাখির তীক্ষ্ণ নখের ছাপ দেয়া কয়েকটা বেলে পাথরের টুকরো এবং পাথরে খোদিত এক অপূর্ব ফার্ন। এসব বস্তু আমার কাছে এক প্রাগৈতিহাসিক জগতের গুপ্তধনের ভাণ্ডার খোলার চাবিকাঠি ছিল। আমি কম্পিত আঙুলে মিস সুলিভানের দেয়া ভয়ঙ্কর জন্তু-জানোয়ারদের বর্ণনা শুনতাম। ওগুলোর নাম ছিল বিদঘুটে আর উচ্চারণের অযোগ্য। যারা একসময় আদিম অরণ্যে দাপিয়ে বেড়াত, বিশাল বিশাল গাছের ডাল ভেঙে নামিয়ে আনত খাবার জন্য এবং মারা গিয়েছিল নিরস গুমোট জলায় নিমজ্জিত হয়ে কোনো এক অজানা যুগে। বহুদিন পর্যন্ত এই অদ্ভুত জীবগুলো আমার স্বপ্নে হানা দিত এবং এই ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন বিষণ্ন দিনগুলো উজ্জ্বল সূর্যলোক, গোলাপ ফুল আর আমার টাট্টু ঘোড়ার খুরের মৃদু শব্দের প্রতিধ্বনিতে ভরে থাকা বর্তমানের এক বিষণ্ন পটভূমিকা রচনা করেছিল।

অন্য একসময় কেউ একজন আমাকে একটা সুন্দর শামুকের খোল দিয়েছিল এবং সেদিন শিশুর বিস্ময়ে আর আনন্দে আমি জেনেছিলাম যে কেমন করে একটা ছোট্ট শামুক তার উজ্জ্বল কুণ্ডলী পাকানো বাসস্থানটি তৈরি করে। আবার কেমন করে নিস্তব্ধ রাতে বাতাস স্থির হয়ে থাকে আর ঐ অবস্থায় সমুদ্রে কোনো ঢেউ ওঠে না। কেমন করে 'নটিলাস' তার 'মুক্তোর জাহাজে' চড়ে ভারত মহাসাগরের নীল জলরাশি পাড়ি দেয়। এরপর আমি সমুদ্রবাসী জীবদের জীবন ও তাদের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে বহু চিত্তাকর্ষক বিষয় জেনেছিলাম– কী করে সমুদ্রের ভয়ঙ্কর ঢেউ-এর মধ্যেও ছোট ছোট 'পলিপেরা' প্রশান্ত মহাসাগরে অনবদ্য সুন্দর প্রবাল দ্বীপ তৈরি করে, ছিদ্রযুক্ত শামুক কীভাবে নানা দেশে গড়ে তোলে চুনাপাথরের পাহাড়। আমার শিক্ষিকা আমাকে 'দ্য চেম্বারড নটিলাস' পড়ে শোনাতেন, এবং আমাকে বুঝিয়ে দিতেন শামুকদের মতো প্রাণীরা কীভাবে তাদের শক্ত খোলস গঠন করে এবং এই গঠন প্রণালীটা হলো মানুষের মনের বিকাশের প্রতীক-স্বরূপ। শামুকেরা যেমন জল থেকে নানা জিনিস শুষে নেয়, এবং তারপর সেগুলোকে নিজের শরীরের অংশ করে নেয় নানা প্রক্রিয়ায়, তেমনি যে জ্ঞান আমরা টুকরো টুকরো ভাবে বা একটু একটু করে লাভ করি সে সবই পরিবর্তিত হয়ে সৃষ্টি করে চিন্তার মণিমুক্তা।

একটি গাছের বেড়ে ওঠার ব্যাপারটা আমার পড়ার বই এর পাঠ হিসাবে রাখা হয়েছিল। আমরা একটা পদ্মের চারা কিনে ওটাকে রৌদ্রালোকিত জানালায় রেখেছিলাম। গাছটি খুব শিগগির সবুজ লম্বা কুঁড়ি ফুটে ওঠার সংকেত দিল। বাইরের দিকের সরু আঙুলের মতো ভঙ্গুর পাতাগুলো ধীরে ধীরে খুলছিল। আমার মনে হচ্ছিল, তারা তাদের গোপন সৌন্দর্যকে প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক ছিল। অবশ্য তারা একবার আত্মপ্রকাশ আরম্ভ করার পর প্রক্রিয়াটা চলল দ্রুতগতিতে, কিন্তু তার মধ্যে ছিল একটা শৃঙ্খলা এবং সুনির্দিষ্ট নিয়ম। সবসময় এমন একটা কুঁড়ি থাকত, যা অন্য সব কুঁড়ি থেকে বেশি বড় আর বেশি সুন্দর হয়ে উঠত। সে তার বাইরের ঢাকনাটা অনেক আড়ম্বরের সাথে খুলত। মনে হতো যেন রেশমী পোষাক পরা এক কোমল সুন্দরী। সে জানত পদ্ম ফুলের রানী স্বর্গীয় অধিকারের বলেই, আর তার ভীরু

www.amarboi.org

বোনেরা সলজ্জভাবে ঘোমটা খুলত যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত চারা গাছটা হিল্লোলিত এবং সুগন্ধী এক বৃক্ষে পরিণত হতো।

একসময় জানালায় গাছভর্তি গোল কাচের পাত্রে এগারোটা ব্যাঙাচি রাখা ছিল। আমি আমার সেই ঔৎসুক্যের কথা মনে করতে পারি, যা আমাকে ওগুলো সম্পর্কে আবিষ্কার করতে উৎসাহিত করেছিল। কাচের পাত্রে হাত ডোবানোটা ছিল ভারি মজার একটা ব্যাপার। যখন আমি অনুভব করতাম ব্যাঙাচিগুলো তিড়িং-বিড়িং করে লাফাচ্ছে এবং আমার হাতের আঙুলের মধ্যে দিয়ে তাদের পিছলে যেতে দিতাম তখন আমি ভীষণ মজা পেতাম। একদিন তাদের মধ্যে একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যাঙাচি একটা লম্বা লাফ দিয়ে পাত্রটার বাইরে এসে মেঝেতে গিয়ে পড়ল। ওটাকে যখন খুঁজে পেলাম, তখন সেটা প্রায় মরে গেছে বলেই মনে হলো। তার লেজের সামান্য কম্পন থেকে তার বেঁচে থাকার লক্ষণ বোঝা গেল। কিন্তু যে মুহূর্তে সে তার পরিবেশে ফিরে গেল, তক্ষুনি পাত্রের নিচের দিকে চলে গেল এবং আনন্দের সাথে সাঁতার কাটতে কাটতে চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সে কাচের পাত্রটি থেকে লাফিয়ে পড়েছিল, এবং যেন বিশাল পৃথিবীটাকে দেখেছিল। এরপরের দিনগুলো নিশ্চিন্তে সুন্দর কাচের বাড়িটাতে সন্তুষ্ট চিত্তেই সে থাকল, বড় ফুসিয়া গাছের তলায় যতদিন পর্যন্ত না সে ব্যাঙ-জীবনের সাবালকত্বে পৌঁছোবার গৌরব অর্জন করল। তারপর সে বাস করতে চলে গেল বাগানের শেষ প্রান্তে থাকা উদ্ভিদপূর্ণ জলাশয়টাতে, যেখানে সে গ্রীষ্মের রাতগুলোকে করে তুলেছিল অদ্ভুত সংগীতময় অথচ মনোরম প্রেমের গানে।

এইভাবে আমি জীবন থেকে শিক্ষা লাভ করেছিলাম। গোড়ার দিকে আমি ছিলাম সম্ভাবনাময় একটা ছোট ডেলা মাত্র। আমার শিক্ষিকাই সেই সম্ভাবনাগুলো উন্মোচিত করেছিলেন এবং তাদের বিকশিত করেছিলেন। তিনি আসার পর আমার চারপাশের সবকিছু ভরে উঠল ভালোবাসায় এবং আনন্দে সবকিছু সত্যিকারের সার্থকতা পেল। তারপর থেকে, সমস্ত জিনিসের মধ্যেই যে রয়েছে সৌন্দর্য তা আমাকে জানানোর কোনো সুযোগই তিনি নষ্ট হতে দেননি বা হাতছাড়া করেননি। চিন্তায়, কর্মে এবং বিভিন্ন দৃষ্টান্তে আমার জীবনকে মধুময় ও প্রয়োজনীয় করে তুলতে তিনি বিরামহীন চেষ্টা করেছিলেন।

আমার শিক্ষিকার প্রতিভা। তাঁর তাৎক্ষণিক সহানুভূতি, তাঁর স্নেহময় বিচক্ষণ কৌশল, আমার শিক্ষার প্রথম বছরগুলোকে মধুময় করে তুলেছিল। এটা সম্ভব হয়েছিল এই কারণেই যে, তিনি শিক্ষার জন্য সবসময়ই সঠিক সময়টি নির্বাচন করে ব্যবহার করতেন যার ফলে শিক্ষা আমার কাছে এত গ্রহণযোগ্য এবং মনোরম হতে পেরেছিল। তিনি জানতেন এবং অনুভব করতেন যে, শিশুর মন একটা ছোট্ট নদীর মতো, যে পড়াশুনার পাথুরে পথে আনন্দে নেচে নেচে বেড়ায় এবং তাতে প্রতিবিম্বিত হয় কখনও একটা ফুল, কখনও একটা ঝোপ, অদূরে ভেসে বেড়ানো একখণ্ড পশমের মতো মেঘ। তিনি চেষ্টা করেছিলেন আমার মনকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে

www.amarboi.org

যেতে, কারণ তিনি জানতেন ছোট নদীতে, পাহাড়ের জলধারা, আর লুকোনো ঝরনা মিলিত হতে থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা এক প্রশস্ত এবং গভীর নদীতে পরিণত হচ্ছে। তখন তার শান্ত তলায় প্রতিফলিত হবে, তরঙ্গায়িত পাহাড়, গাছের উজ্জ্বল ছায়া, নীল স্বর্গীয় আকাশের ছায়া এবং সেই সাথে ছোট ফুলের মিষ্টি মুখ।

যে কোনো শিক্ষকই একটি শিশুকে বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে নিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু সব শিক্ষাই তাকে শেখাতে পারেন না। সে আনন্দের সাথে কাজ করবে না যদি না সে অনুভব করে যে, ব্যস্ত বা বিশ্রামে থাকার সময় সে স্বাধীন। যে কাজ তার কাছে নীরস, বিস্বাদ, তাতে মনোনিবেশ করার আগে অথবা গতানুগতিক নীরস পাঠ্যপুস্তকের পথ ধরে যাওয়ার সংকল্প করার আগে সে যেন অবশ্যই জয়ের আনন্দের উল্লাস অনুভব করতে পারে যাতে বিষাদময় কর্মভার নেওয়ার ইচ্ছার আগে হতাশায় ডুবে যাওয়া মন আনন্দ নৃত্যে রূপান্তরিত হয়ে ওঠে এবং যাতে সে পাঠ্যপুস্তকের নীরস সময়সূচিকে সাহসের সাথে পার হতে পারে।

আমার শিক্ষিকা আমার এত কাছের মানুষ ছিলেন যে, আমি কদাচিৎ তাঁর থেকে নিজেকে পৃথক হিসেবে ভাবতে পেরেছি। কোনো সুন্দর জিনিসে আমার আনন্দিত হয়ে উঠার ব্যাপারটা কতটুকু আমার সহজাত ছিল আর কতটুকুই বা তাঁর প্রভাবে ঘটত, এখন আমি আর তা সঠিকভাবে বলতে পারব না। আমি অনুভব করি যে তাঁর অস্তিত্ব আমার থেকে আলাদা করা অসম্ভব, এবং আমার জীবনের পদচিহ্ন তাঁরই পদচিহ্ন। আমার মধ্যে যা কিছু সর্বোত্তম তা তাঁরই– আমার এমন কোনো প্রতিভা নেই, এমন কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই, নেই এমন কোনো আনন্দ যা কিনা তাঁর ভালোবাসার স্পর্শে জেগে ওঠেনি।

www.amarboi.org

আট

মিস সুলিভান তাসকাম্বিয়ায় আসার পর প্রথম বড়দিনটি ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পরিবারের প্রত্যেকেই আমার জন্য কিছু না কিছু চমৎকার জিনিস তৈরি করেছিলেন। কিন্তু যা আমাকে সবচেয়ে বেশি আনন্দ দিয়েছিল তা হলো মিস সুলিভান এবং আমি প্রত্যেকের জন্য একটি করে চমকপ্রদ বস্তু তৈরি করেছিলাম। যে রহস্যময়তা ঐ উপহারগুলোকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল, তা ছিল আমার কাছে সব থেকে বেশি আনন্দের এবং আমোদের। আমার বন্ধুরা যতটা সম্ভব চেষ্টা করেছিল আমার কৌতূহলকে উদ্দীপ্ত করতে। তারা ওটা করেছিল বিভিন্ন রকম ইঙ্গিত ও আভাস দিয়ে এবং অর্ধেক বানান করা বাক্য দিয়ে। তারা এমন ভান করেছিল যে তারা প্রকাশ করবে যথাযথ সময়ে। মিস সুলিভান আর আমি এ নিয়ে আন্দাজ করার খেলায় মেতে উঠলাম। আমাকে ভাষা ব্যবহার সম্বন্ধে একগুচ্ছ পাঠ যা শেখাতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশি শিখিয়েছিল সে খেলা। প্রতি সন্ধ্যায় গনগনে কাঠের আগুনের কাছে বসে আমরা 'আন্দাজ করার' খেলা খেলতাম। ক্রিসমাস-এর দিন যত এগিয়ে আসতে লাগল, ততই তা হয়ে উঠতে লাগল আরো বেশি উত্তেজনাময়।

বড়দিনের উৎসবের আগের দিন তাসকাম্বিয়ার স্কুলের ছেলেমেয়েরা তাদের ক্রিসমাস গাছটা পেয়েছিল এবং এ উপলক্ষে তারা আমন্ত্রণ জানিয়েছিল আমাকে। শ্রেণীকক্ষের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল একটা সুন্দর গাছ। তা চকচক করছিল এবং কেঁপে কেঁপে উঠছিল নরম আলোয়। আর ডালপালাগুলো পূর্ণ ছিল অদ্ভুত ও বিস্ময়কর সব ফলে। এটা ছিল অপার আনন্দের একটা মুহূর্ত। আমি গাছটার চারপাশে উচ্ছ্বাসে তিড়িং-বিড়িং করে নাচতে লাগলাম। আমি যখন জানলাম যে প্রত্যেক শিশুর জন্যই একটা করে উপহার আছে, তখন আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলাম। সেই সব সহৃদয় ব্যক্তিরা যাঁরা গাছটি তৈরি করেছিলেন, শিশুদের হাতে উপহার তুলে দেওয়ার জন্য আমাকে তারা অনুমতি দিয়েছিলেন। এই কাজটা করার আনন্দে আমি আমার নিজের উপহারগুলো দেখার জন্য থামিনি; কিন্তু যখন আমি ওগুলো দেখার জন্য প্রস্তুত হলাম, তখন বড়দিনের ভাবনায় এতটাই অধৈর্য হয়ে পড়লাম যে, তা সামলানো আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ল। আমি জানতাম, আমার বন্ধুরা যে উপহারগুলো সম্বন্ধে আভাস দিয়ে আমাকে আগ্রহী ও উত্তেজিত করেছিল, সেগুলো তখনও পর্যন্ত পাওয়া আমার উপহারগুলোর মধ্যে ছিল না এবং আমার শিক্ষিকা আমাকে বলেছিলেন, যে উপহারগুলো আমি পাবো, সেগুলো ইতিমধ্যে পাওয়া উপহারগুলোর চেয়েও ভালো হবে। আমাকে অবশ্য গাছ থেকে পাওয়া উপহারগুলো নিয়ে তখনকার মতো সন্তুষ্ট থাকতে বলা হয়েছিল এবং অন্য উপহারগুলোর জন্য পরের দিন সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে রাজি করানো হয়েছিল।

www.amarboi.org

সে রাতে আমার মোজাটা টাঙিয়ে রাখার পর আমি ঘুমের ভান করে অনেকক্ষণ পর্যন্ত সতর্ক হয়ে জেগে শুয়েছিলাম সান্তা ক্লজ এসে কী করে তা দেখার জন্য। শেষ পর্যন্ত আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম একটা নতুন পুতুল এবং একটা সাদা ভালুক হাতে নিয়ে। পরদিন সকালে প্রথম আমিই 'মেরি ক্রিসমাস' সম্ভাষণ জানিয়ে বাড়ির সকলকে জাগিয়েছিলাম! আমি দেখতে পেয়েছিলাম অনেক চমৎকার জিনিস, যেগুলো শুধু মোজার ভিতরে নয়, ছিল টেবিলের ওপর, চেয়ারের ওপর, দরজার পাশে, প্রত্যেকটা জানালার চৌকাঠের ওপর। সত্যি বলতে কী টিসু কাগজে মোড়া কোনো কোনো ক্রিসমাসের উপহারের ওপরে হোঁচট খেয়ে না পড়ে আমি হাঁটতেই পারছিলাম না! কিন্তু যখন আমার শিক্ষিকা আমাকে একটা ক্যানারি পাখি দিয়েছিলেন আমার আনন্দের পেয়ালাটা তখন উপচে পড়েছিল।

ছোট্ট টিম মানে ক্যানারি পাখিটা এত শান্ত ছিল যে, সে আমার আঙুলের ওপর লাফাত এবং আমার হাত থেকে মিষ্টি চেরিফল খেত। মিস সুলিভান আমাকে শিখিয়েছিলেন কীভাবে আমার নতুন পোষা প্রাণীটির যত্ন করতে হবে। প্রতিদিন সকালে জলখাবার শেষে আমি তার গোসলের ব্যবস্থা করতাম, তার জন্য রাখা পেয়ালাগুলো টাটকা শস্যের দানা দিয়ে আর কুয়োঘর থেকে পানি এনে ভর্তি করতাম– এরপর খাবার পানিসহ তাকে দোলনায় করে টাঙিয়ে দিতাম চিকউইড'-এর ডালে।

একদিন সকালে খাঁচাটা জানালার বেদীর ওপর রেখে ওর গোসলের জন্য পানি আনতে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দরজা খুলতেই মনে হলো একটা বড় বিড়াল আমার গা ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। কী ঘটেছে তা বুঝে উঠতে পারিনি প্রথমে; কিন্তু যখন খাঁচার ভিতর হাত ঢোকালাম তখন টিমের পালকের নরম স্পর্শ পেলাম না, অথবা তার ছুঁচালো নখ আমার আঙুল ধরলো না, তখন আমি জেনে গেলাম যে আমি আর কোনোদিনও আমার ছোট্ট গায়ককে দেখতে পাবো না।

www.amarboi.org

নয়

আমার জীবনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ছিল ১৮৮৮ সালের মে মাসে বস্টন যাওয়া। গতবার ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনার মতোই আমি মনে করতে পারি বস্টন যাত্রার প্রস্তুতির কথা, মনে করতে পারি আমার শিক্ষিকা এবং আমার মায়ের সাথে যাওয়া সেই ভ্রমণের কথা এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের বস্টনে এসে পৌঁছনোর কথাও। দুবছর আগে আমার বাল্টিমোর যাওয়ার সাথে কত তফাৎ ছিল এ যাত্রার। আমি আগের মতো চঞ্চল আর অতি উৎসাহী ছোট্ট শিশু ছিলাম না। আমি শান্তভাবে মিস সুলিভানের কাছে বসে অধীর আগ্রহে তার কথা শুনতাম। তিনি বলতেন, গাড়ির জানালা দিয়ে দেখা সব জিনিস সম্বন্ধে– রূপময়ী টেনেসি নদী, সুবিশাল তুলোক্ষেত, পাহাড়, বনবনানী, স্টেশনে স্টেশনে দেখা হাসিখুশি নিগ্রো– যারা যাত্রীদের দিকে হাত নাড়ত এবং যাত্রীদের জন্য আনত সুস্বাদু মিছরি আর ভুট্টার খই-এর মোয়া এবং সেগুলো এগিয়ে দিত গাড়ির জানালা দিয়ে। গাড়িতে আমার আসনের বিপরীত দিকে বসেছিল আমার ন্যাকড়ার বড় পুতুল ন্যান্সি– যে পরেছিল ডোরাকাটা এবং চৌখুপী আঁকা পোশাক এবং মাথায় কুঁচি দেওয়া রোদ টুপি। সে তার পুঁতির চোখ দুটো দিয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিল। কখনও কখনও যখন আমি মিস সুলিভানের বর্ণনায় মগ্ন থাকতাম না, তখন আমার ন্যান্সির অস্তিত্বের কথা মনে পড়ে যেত এবং তাকে আমার কোলে তুলে নিতাম কিন্তু সাধারণত আমি আমার বিবেককে প্রবোধ দিতাম এই বলে যে ন্যান্সি ঘুমিয়ে আছে।

যেহেতু ন্যান্সির সম্বন্ধে বলার সুযোগ আর হবে না, তাই এখানে আমি একটা দুঃখজনক অভিজ্ঞতার কথা বলতে চাই। ঘটনাটি ঘটেছিল আমরা বস্টনে আসার পর। ন্যান্সির গা-টা ঢেকে গিয়েছিল ধুলোয়– আসলে ওগুলো ছিল আমি ওকে কাদা দিয়ে তৈরি যে পিঠেগুলো খেতে বাধ্য করতাম তাদের অবশিষ্ট। যদিও সে ওগুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখায়নি কখনও। পারকিনস্ ইনসটিটিউশন এর ধোপানী ওটাকে গোপনে নিয়ে গিয়েছিল স্নান করানোর জন্য। বেচারি ন্যান্সির পক্ষে এই ধকলটা বড্ড বেশি ছিল। এরপর যখন আমি তাকে দেখলাম, তখন সে দেখতে হয়ে গিয়েছিল তালগোল পাকানো একটা তুলোর স্তূপ, আর পুঁতির চোখ দুটো যারা আমার দিকে অনুযোগভরা দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। সেগুলো না থাকলে আমি তাকে একেবারেই চিনতে পারতাম না।

শেষে রেলগাড়ি যখন বস্টন স্টেশনে ঢুকল, তখন মনে হলো যে একটা সুন্দর রূপকথার গল্প সত্যি হয়ে হাজির হয়েছে। সেই 'কোনো এক সময়'-টা পরিণত হলো এখন-এ আর 'বহু দূরের দেশ'-ও পরিণত হলো, এখানে!

www.amarboi.org

পারকিনস্ ইনস্টিটিউশন ফর দ্য ব্লাইন্ড-এ পৌঁছতেই আমি অন্ধ শিশুদের সাথে বন্ধুত্ব করতে শুরু করি। এখানকার শিশুরা আমার মতোই মূক-বধিরদের শিক্ষার জন্য যে বর্ণমালা আছে তা জানে, একথা জানতে পেরে কী আনন্দ যে পেয়েছিলাম তা প্রকাশ করা যায় না। আমার নিজরে ভাষায় অন্য শিশুদের সাথে কথা বলার আনন্দ যে কী রকম, তা বলে বোঝাতে পারবো না। এর আগ পর্যন্ত আমি ছিলাম একজন বিদেশির মতো, যে কথাবার্তা বলত দোভাষীর মাধ্যমে। লরা ব্রিজম্যান যে বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছে, সে বিদ্যালয় তো আমার নিজের দেশের মতোই। আমার নতুন বন্ধুরা সকলেই অন্ধ, এই সত্যটা উপলব্ধি করতে আমার বেশ কিছুটা সময় লেগেছিল। আমি জানতাম আমি দেখতে পাই না; কিন্তু এটা সম্ভব বলে আমার মনে হয়নি যে, এইসব আগ্রহী, স্নেহশীল এবং সদয় শিশুরা যারা আমার চারপাশে জড়ো হয়েছে এবং আন্তরিকতার সাথে আমার আনন্দে যোগ দিয়েছে, তারাও অন্ধ। আমার মনে পড়ে সেই বিস্ময় এবং বেদনা, যা আমি অনুভব করেছিলাম। আমি লক্ষ করেছিলাম যে, যখন আমি তাদের সাথে কথা বলছিলাম, তারা আমার হাতের উপর তাদের হাত রেখেছিল এবং তারা বইও পড়ছিল আঙুল দিয়ে। যদিও এ ব্যাপারটা আমাকে আগেই বলা হয়েছিল এবং আমি আমার ক্ষতি ও বঞ্চনার কথা জানতাম, তবুও অস্পষ্ট ও অনির্দ্দিষ্টভাবে ভেবেছিলাম যে, যেহেতু ওরা কানে শুনতে পায়, তাই ওদের নিশ্চয়ই 'দ্বিতীয় দৃষ্টি'র মতো এক রকমের ক্ষমতা আছে এবং আমি মানসিকভাবে সে জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। এমন একটি শিশু, তারপর আর একটি শিশু, তারপর আরও একটি শিশুকে খুঁজে পাই যারা ঐ অমূল্য উপহার থেকে বঞ্চিত। কিন্তু তারা এত সুখী এবং সন্তুষ্ট ছিল যে, তাদের সাহচর্য পাওয়ার আনন্দে আমি দুঃখের সব অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছিলাম।

নতুন পরিবেশে অন্ধ শিশুদের সাথে একটা দিন কাটানোর পর অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিলাম আমি এবং আগ্রহ নিয়ে নতুন নতুন সুখকর অভিজ্ঞতা লাভের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। দিনগুলো বয়ে যেতে লাগল দ্রুত গতিতে। আমি কোনো কিছু দিয়েই নিজেকে বিশ্বাস করাতে পারিনি যে বস্টনের বাইরেও রয়েছে এক সুবিশাল জগৎ। কারণ আমি বস্টনকেই মনে করতাম সৃষ্টির আদি এবং অন্ত।

বস্টনে থাকার সময় আমরা বাঙ্কার হিলে বেড়াতে গিয়েছিলাম এবং ওখানেই আমি ইতিহাসের প্রথম পাঠ নিয়েছিলাম। আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখানেই অতীতে কোনো একজন যোদ্ধা সাহসের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন– এই কাহিনী আমাকে প্রবলভাবে উত্তেজিত করেছিল। আমি সিঁড়ি গুণতে গুণতে স্মৃতিস্তম্ভের ওপরে যত উঠতে থাকলাম তত আশ্চর্য হয়ে ভাবলাম সৈন্যেরা এই বিশাল মাপের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে নিচে থাকা শত্রুদের গুলি করেছিল।

পরের দিন আমরা জলপথে প্লাইমাউথে গিয়েছিলাম। এটাই ছিল আমার প্রথম সমুদ্রযাত্রা এবং সেই প্রথম আমি কোনো জাহাজে চেপেছিলাম। কী প্রাণবন্ত আর গতিময় ছিল সেই যাত্রা! কিন্তু ইঞ্জিনের গুড়গুড় শব্দ আমাকে বজ্রপাতের কথা মনে

www.amarboi.org

করিয়ে দিয়েছিল এবং আমি কাঁদতে আরম্ভ করেছিলাম এই ভেবে যে, যদি বৃষ্টি হয় তবে আমরা বাড়ির বাইরে চড়ুইভাতি করতে পারবো না। আমি বেশি আগ্রহী ছিলাম, প্লাইমাউথের বিশাল পাহাড়টা সম্বন্ধে, যেখানে ভ্রমণকারী তীর্থযাত্রীদের প্লাইমাউথে আগমন, তাঁদের পরিশ্রম এবং তাঁদের মহান কীর্তিকে আরো বেশি করে বাস্তব করে তুলল। আমি প্রায়ই প্লাইমাউথ পাহাড়ের একটা ক্ষুদ্রাকার প্রতিরূপ হাতে রেখেছিলাম। একজন সহৃদয় ভদ্রলোক আমাকে এটা দিয়েছিলেন পিলগ্রিম হলে। আমি এটার মাঝখানে থাকা খাঁজকাটা বাঁকা অংশের ওপর হাত বোলালাম এবং খোদাই করা সংখ্যা '১৬২০'-এর ওপরও হাত বোলালাম এবং বার বার মনে করতে থাকলাম আমার জানা তীর্থযাত্রীদের বিস্ময়কর কাহিনী।

আমার শিশুসুলভ কল্পনা উজ্জ্বল আর উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল তাঁদের দুঃসাহসিক কর্ম প্রচেষ্টার চমৎকারিত্বে। আমি তাঁদের সবচেয়ে দুঃসাহসী এবং সবচেয়ে উদারমনা মানুষ হিসাবে আদর্শায়িত করেছিলাম, যাঁরা অচেনা দূরবর্তী কোনো দেশে স্বভূমি পেতে চেয়েছিলেন। আমি মনে করেছিলাম তাঁরা তাঁদের সঙ্গী এবং নিজেদের মানুষের মুক্তি চেয়েছিলেন। আমি গভীরভাবে বিস্মিত এবং হতাশ হয়েছিলাম অনেক বছর পরে এই কথা জেনে যে, ধর্মের নামে তাঁরা অত্যাচার চালিয়েছিলেন যা আমাদের লজ্জায় আরক্তিম করে। এমনকি তখনও যখন আমরা তাঁদের সাহস ও শক্তিতে গৌরব বোধ করি– যে শক্তি আমাদের উপহার দিয়েছে এই 'সুন্দর দেশ'।

বস্টনে অনেকের সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিলেন মি. উইলিয়াম এন্ডিকট এবং তাঁর মেয়ে। আমার প্রতি তাদের সহৃদয়তা ছিল বীজের মতো, যা থেকে বহু মধুর স্মৃতি জন্ম নিয়েছিল। একদিন আমরা তাঁদের বেভারলি ফার্মের সুন্দর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আনন্দের সাথে মনে করতে পারি কীভাবে তাঁদের গোলাপ বাগানের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলাম, কেমন করে তাঁদের কুকুরগুলো আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিল। এর মধ্যে ছিল বিশাল আকারের লিও এবং কোঁকড়ানো লোমে ঢাকা ছোট্ট ফ্রিৎজ। এবং কেমনভাবে ঘোড়াদের মধ্য সব থেকে দ্রুতগামী ঘোড়া নিমরড তার নাক দিয়ে আমার হাতে খোঁচা দিয়েছিল যাতে আমি তাকে আদর করে চাপড় মারি এবং একমুঠো চিনি খেতে দিই। আমার মনে আছে সমুদ্র সৈকতের কথা, যেখানে আমি প্রথমবার বালির ওপর খেলেছিলাম। সমুদ্র সৈকতটা ছিল শক্ত ও মসৃণ বালির, যা ছিল ব্রিউস্টারের আলগা, ধারালো এবং সামুদ্রিক গুল্ম আর শামুক ও ঝিনুক মেশানো বালি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। মি. এন্ডিকট সেই সব বড় বড় জাহাজ সম্বন্ধে আমাকে বলেছিলেন, যেগুলো ইউরোপে যাওয়ার পথে বস্টনের পাশ দিয়ে ভেসে যেত। এরপর আমি তাঁর সাথে অনেক বার দেখা করেছিলাম। এবং তিনি সবসময়ই আমার খুব ভালো বন্ধু ছিলেন। সত্যি কথা বলতে কী, আমি যখন বস্টনকে 'হৃদয়বান মানুষের শহর' বলেছিলাম তখন তাঁর কথাই ভাবছিলাম।

www.amarboi.org

দশ

পারকিনস্ ইনস্টিটিউশন গ্রীষ্মকালীন ছুটির জন্য বন্ধ হওয়ার আগেই ঠিক করা হয়েছিল আমার শিক্ষিকা এবং আমি ছুটি কাটাব কেপ-কড অন্তরীপের ব্রিউস্টারে আমাদের প্রিয় বন্ধু মিসেস হপ্‌কিন্‌সের সাথে। আমি উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম কেননা আমার মন ভরপুর ছিল সম্ভাব্য আনন্দের আশায় এবং সমুদ্র সম্পর্কে যে সব অপূর্ব গল্প শুনেছিলাম সেগুলো সত্যি হবে এমন ভাবনায়।

সেই গ্রীষ্মের সবচেয়ে উজ্জ্বল স্মৃতি হলো সমুদ্র। আমি সব সময়ই সমুদ্র থেকে বহু দূরে দ্বীপের ভিতরে দিকে বাস করতাম বলে নোনা বাতাসের সামান্যতম কষাঘাত সহ্য করতে হয়নি। তবে এ সম্পর্কে একটা বড় বই 'আওয়ার ওয়াল্ড'-এ সমুদ্রের বর্ণনা পড়েছিলাম যা আমাকে বিস্মিত করেছিল এবং সমুদ্রকে ছোঁয়ার এবং তার গর্জন অনুভব করার একটা গভীর বাসনা জাগিয়ে দিয়েছিল। তাই ব্যগ্র উত্তেজনায় আমার ছোট্ট হৃদয় লাফিয়ে উঠেছিল যখন আমি জানতে পারলাম যে শেষ পর্যন্ত আমার ইচ্ছা বাস্তবায়িত হতে চলেছে।

যখনি আমাকে স্নানের পোশাক পরতে সাহায্য করা হয়েছিল, তখনি আমি গরম বালির ওপর লাফিয়ে পড়লাম আর কোনো চিন্তা অথবা ভয় না করে সমুদ্রের ঠাণ্ডা পানিতে ঝাঁপ দিলাম। আমি বড় বড় ঢেউগুলোর লাফিয়ে ওঠা এবং আছড়ে পড়া অনুভব করলাম। পানির প্রাণবন্ত গতি আমাকে এক অনির্বচনীয় শিহরণ সৃষ্টিকারী আনন্দে পূর্ণ করেছিল। হঠাৎ আমার উচ্ছ্বাসের স্থানে দেখা দিল আতঙ্ক; কেননা আমার পা একটা পাথরে ধাক্কা খেল আর পরমুহূর্তেই আমার ওপর ভেঙে পড়ল তীব্র বেগে ছুটে আসা জলরাশি। কিছু একটা ধরার আশায় আমি হাত ছুঁড়লাম, শুধু ধরতে পারলাম পানি এবং সামুদ্রিক আগাছা সমুদ্রের ঢেউ ওগুলো আমার মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়েছিল। আমার প্রাণপণ প্রচেষ্টা বিফলে গেল। মনে হলো ঢেউগুলো আমাকে নিয়ে খেলছে এবং বন্য কৌতুকে আমাকে এক দিক থেকে আর এক দিকে ছুঁড়ে মারছে। এটা ছিল ভয়ংকর। আমার পায়ের তলা থেকে পরম প্রিয়, দৃঢ়, শক্ত পৃথিবীর মাটি সরে যাচ্ছিল এবং মনে হচ্ছিল– জীবন, বাতাস, উষ্ণতা এবং ভালোবাসা সবকিছু আমার কাছ থেকে মুছে যাচ্ছিল। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সমুদ্র যেন আমার মতো একটা নতুন খেলনা নিয়ে খেলার পর ক্লান্ত হয়ে আমাকে সমুদ্রের তীরে ফিরিয়ে দিয়েছিল, আর তার পরমুহূর্তেই আমি ধরা পড়েছিলাম আমার শিক্ষিকার বাহুবন্ধনে। আহা, দীর্ঘ, কোমল আলিঙ্গনে কী পরম প্রশান্তি! আতঙ্ক থেকে মুক্ত হয়ে আমি সর্বপ্রথম যা জানতে চেয়েছিলাম তা হলো, 'সমুদ্রের পানিতে এত লবণ কে মিশিয়েছে।'

www.amarboi.org

সমুদ্রে নামার প্রথম অভিজ্ঞতার ধাক্কা সামলে ওঠার পর, স্নানের পোশাক পরে একটা বড় পাথরের ওপর বসে আমার মনে হলো যে একটার পর একটা ঢেউ পাথরের ওপর আছড়ে পড়ে যে জলধারা আমার ওপর বর্ষণ করছে, তা অনুভব করা একটা মজার ব্যাপার। আমি অনুভব করেছিলাম যে, তীরে আছড়ে পড়া ঢেউগুলোর ওজন নুড়ি-পাথরগুলোকে গড়গড় শব্দ করিয়েছিল। সমস্ত সমুদ্রতীর যেন আন্দোলিত হয়েছিল ঢেউগুলোর আক্রমণে এবং বাতাস স্পন্দিত হয়েছিল সবেগে। চূর্ণকারী ঢেউগুলো অর্ধ বৃত্তাকারে ফিরে গিয়ে নিজেদের সংহত করেছিল আরো শক্তি নিয়ে লাফিয়ে পড়ার জন্য, আর আমি উৎকণ্ঠিত মুগ্ধতা নিয়ে অনুভব করেছিলাম তীব্র বেগে ধাবমান সমুদ্রের আছড়ে পড়া গর্জনকে। আঁকড়ে ধরেছিলাম পাথরটাকে!

আমি কখনই খুব বেশিক্ষণ সমুদ্রের পারে থাকতে পারতাম না। অমলিন সামুদ্রিক বাতাসের গন্ধ এবং টাটকা বাতাস ছিল শীতল হৃদয় জুড়ানো প্রশান্ত চিন্তার মতো আর শামুক, ঝিনুক, শঙ্খ, কচ্ছপ, নুড়ি-পাথর এবং সামুদ্রিক উদ্ভিদের গায়ে লেগে থাকা ছোট্ট জীবন্ত প্রাণীগুলো আমার কাছে তাদের আকর্ষণ হারায়নি কখনও। একদিন মিস সুলিভান একটা বিচিত্র জীবের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন যখন ওটা অগভীর জলে রোদ পোহাচ্ছিল তখনই ওটাকে ধরেছিলেন। ওটা ছিল ঘোড়ার নালের মতো দেখতে একটা কাঁকড়া। ঐ ধরনের কোনো কাঁকড়া সেই প্রথমবার আমি দেখেছিলাম। আমি অনুভব করেছিলাম যে, এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে কাঁকড়াটা তার বাড়িটা নিজের পিঠে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ একটা চিন্তা আমার মাথায় এলো– এটাকে হয়ত একটা বেশ আনন্দদায়ক পোষা জীব বানানো যেতে পারে। তাই আমি আমার দু'হাত দিয়ে ওটার লেজ চেপে ধরে বাড়ি নিয়ে এলাম। এটা একটা সাহসী কাজ বলে আমার মনে হয়েছিল এবং এই কাজটা আমাকে খুব আনন্দ দিয়েছিল; কাঁকড়ার দেহটা যেহেতু খুবই ভারী ছিল, তাই ওটাকে বয়ে আনতে আমাকে সমস্ত শক্তি ব্যবহার করতে হয়েছিল। আমি মিস সুলিভানকে শান্তিতে থাকতে দিইনি যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি কাঁকড়াটাকে কুয়োর কাছে একটা কাঠের ডাবায় রেখেছিলেন। আমার বিশ্বাস ছিল, ওটা ওখানে নিরাপদে থাকবে। পরের দিন সকালেই কাছে গিয়ে দেখি কাঁকড়াটা অদৃশ্য হয়ে গেছে! কেউ জানাতে পারেনি সে কোথায় চলে গিয়েছিল এবং কীভাবেই বা পালিয়েছিল। সেই সময় আমার হতাশা ছিল তীব্র, তিক্ত। তারপর ধীরে ধীরে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে এইভাবে কোনো অসহায় অবলা প্রাণীকে তার পরিবেশ থেকে জোর করে দূরে সরিয়ে রাখাটা সহৃদয়তা বা বুদ্ধিমত্তার কাজ নয় এবং কিছু সময় পর এই ভেবে সুখ অনুভব করেছিলাম যে সম্ভবত সে সমুদ্রে ফিরে গেছে।

www.amarboi.org

এগার

হৃদয় পূর্ণ করা এক আনন্দময় স্মৃতি নিয়ে শরৎকালে আমি ফিরে এলাম আমার দক্ষিণের বাড়িতে। যখনই আমি উত্তরে ভ্রমণ করার কথা মনে করি, তখনই আমি পূর্ণ হয়ে উঠি এক দারুণ বৈচিত্রপূর্ণ অভিজ্ঞতায়। মনে হয়, এটাই আরম্ভ ছিল সব কিছুর। এক নতুন সুন্দর পৃথিবীর বিপুল ঐশ্বর্য রাখা ছিল আমার পায়ের নিচে এবং আমি প্রেরণা আর তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম জীবনের প্রতিটি বাঁক থেকে। আমি সবকিছুর সাথেই নিজেকে যুক্ত করেছিলাম। আমি এক মুহূর্তও স্থির হয়ে থাকতাম না। আমার জীবন পূর্ণ ছিল গতিময়তায় ছোট্ট পতঙ্গদের মতো, যারা ভিড় করেছিল আমার সমগ্র জন্ম-মৃত্যুর ধারাতে, একটা দিনের ক্ষুদ্র পরিসরে। আমি বহু মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলাম যারা আমার সাথে কথা বলত, আমার হাতের উপর লিখত। আনন্দময় সেই চিন্তার সহানুভূতির স্পর্শে উদ্বেল হতো মন, চাইত অন্যের চিন্তা ধারায় মিলতে। কী আশ্চর্য, তা থেকে এক অলৌকিকতার সৃষ্টি হতো! আমার চিন্তার স্বভূমি এবং অপর সকলের চিন্তার মধ্যে যে ঊষর ভূমি বিস্তৃত ছিল, তা সহসা বিকশিত হয়ে উঠেছিল গোলাপের মতো।

আমি শরৎকালের মাসগুলো কাটিয়েছিলাম আমার পরিবারের সাথে আমাদের গ্রীষ্মকালীন কুটিরে। সেটা ছিল একটা পাহাড়ের ওপরে প্রায় চৌদ্দ মাইল দূরে তাসকাম্বিয়া থেকে। এই জায়গাটাকে বলা হতো 'ফার্ন কোয়ারি'। কারণ এর কাছেই ছিল একটা চুনা পাথরের খনি– যেটা অনেক দিন ধরে পরিত্যক্ত। তিনটি উচ্ছল নদী বয়ে গিয়েছিল ঐ জায়গার ওপর দিয়ে, যে নদীগুলো উপরের পাহাড়ে থাকা ঝরনাগুলো থেকে বেরিয়ে কোথাও লাফিয়ে, আবার কোথাও হোঁচট খেতে খেতে হাস্যময় জলপ্রপাতে পরিণত হয়েছিল, যেখানে পাহাড় তাদের গতিপথ রুদ্ধ করে দিতে চেষ্টা করেছিল। ফাঁকা জায়গাটা ভর্তি ছিল ফার্ন গাছে যেগুলো চুনা পাথরের স্তরগুলোকে পুরোপুরি ঢেকে রেখেছিল, কোথাও কোথাও তারা লুকিয়ে রেখেছিল নদীগুলোকে। পাহাড়ের অবশিষ্ট অংশ ছিল ঘন বৃক্ষাচ্ছাদিত। এখানে ছিল বিশাল বিশাল ওক গাছ এবং অত্যুৎকৃষ্ট চিরহরিৎ বৃক্ষরাজি যাদের গুঁড়িগুলো দেখতে শ্যাওলাধরা থামের মতো, যে গাছগুলোর ডালপালা থেকে চিরহরিৎ 'আইভি' লতার এবং চিরহরিৎ পরাশ্রয়ী গুল্ম 'মিস্টলেটো'র মাথা ঝুলে পড়েছিল, আর ছিল এক প্রকার খেজুরগাছ, পার্সিমোন, যার ফলের সুগন্ধ ছড়িয়েছিল বনের প্রত্যেকটা কোণে– এমন এক মায়াময় সুগন্ধ যা হৃদয়কে করত প্রফুল্ল ও স্নিগ্ধ। কোথাও কোথাও বুনো 'মাসকাডাইন' আর 'স্কাপারনং' লতাগুলো এক গাছ থেকে আর এক গাছে বিস্তৃত ছিল। এগুলো দেখতে ছিল অনেকটা কুঞ্জবনের মতো। এগুলো সবসময় পূর্ণ থাকত প্রজাপতি আর গুঞ্জনরত কীটপতঙ্গে। জটপাকানো গাছেদের ভিড়ের ফাঁকে ফাঁকে নিজেদের হারিয়ে

www.amarboi.org

ফেলা, পড়ন্ত কোনো বিকেলে তৃপ্তিকর সেই গন্ধের ঘ্রাণ নেওয়া, যে গন্ধ উঠে আসত পৃথিবীর মাটি থেকে দিনের শেষে– সবই ছিল অপার আনন্দের বিষয়।

আমাদের কুটিরটা ছিল মনোরম একটা পাহাড়ের চূড়ায়, ওক আর পাইন বনের মধ্যে এক রকমের সাধারণ, অনাড়ম্বর অস্থায়ী ছাউনির মতো। কুটিরের ছোট ছোট ঘরগুলো সাজানো ছিল একটা উন্মুক্ত লম্বা হলঘরের দুধারে। ঐ হলঘরটার চারপাশ ঘিরেছিল একটা বিস্তৃত 'পিয়াৎজা' যার ওপর দিয়ে বয়ে যেতো পাহাড়ি বাতাস যা পূর্ণ হয়ে থাকতো নানা গাছের সুমিষ্ট গন্ধে। আমরা বেশির ভাগ সময়ই থাকতাম 'পিয়াৎজা'-তে। সেখানে আমরা কাজ করতাম, খেতাম এবং খেলতামও। খিড়কির দরজার কাছেই ছিল একটা বিশাল 'বাটারনাট' গাছ, যাকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল সিঁড়িগুলো। গাছগুলোর সামনের অংশ এত কাছে ছিল যে আমি তাদের স্পর্শ করতে পারতাম। অনুভব করতে পারতাম তাদের কম্পন, যখন বাতাস দোলা দিত তাদের ডালপালাগুলোকে অথবা গাছের পাতাগুলো আবর্তিত হতো শরতের বাতাসের ঝাপটায়।

ফার্ন কোয়ারিতে অনেকেই দেখা করতে আসত। সন্ধ্যায় শিবিরের আগুনের পাশে বসে পুরুষেরা তাস খেলত এবং স্বচ্ছন্দে সময় কাটাত গল্পগুজব আর হাসি ঠাট্টা করে। তারা তাদের সাহসিকতার কাহিনী বলত– বর্ণনা করত কে কতগুলো পাখি, মাছ এবং চারপেয়ে জন্তুর সাথে লড়েছিল। তারা বলত কে কটা বুনো হাঁস ও টার্কি গুলি করে শিকার করেছিল। বলত কী ধরনের 'হিংস্র ট্রাউট' মাছ তারা ধরেছিল, সব থেকে ধূর্ত শিয়ালদের শিকার করেছিল, সব থেকে চতুর পোসামদের হারিয়ে দিয়েছিল চতুরতায়, এবং দৌড়ে পরাস্ত করেছিল সবথেকে দ্রুত ধাবমান হরিণকে। এসব গল্প তারা যখন বলতে থাকত তখন আমার মনে হতো যে সিংহ, বাঘ, ভালুক এবং অন্য কোনো বন্য জন্তু এই সব কৌশলী শিকারীদের সামনে দাঁড়াতেই পারবে না। 'আগামীকাল শিকারে যাওয়া হবে!' এই কথাগুলোই ছিল তাদের শুভরাত্রি বলা। কথাটা তারা বলত বৃত্তাকারে ঘিরে থাকা আনন্দিত বন্ধুদের সে রাতের মতো চলে যাওয়ার আগে। পুরুষেরা ঘুমোত হলঘরে আমাদের দরজার বাইরে। হাতের কাছে পাওয়া জিনিস ব্যবহার করে বানানো বিছানায় শুয়ে থাকা কুকুর এবং শিকারীদের গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ আমি অনুভব করতে পারতাম।

ভোরবেলা আমার ঘুম ভাঙত কফির গন্ধে, বন্দুকের ঘর্ঘর শব্দে এবং মানুষের ভারী ভারী পায়ের শব্দে। তারা লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটত আর আগামী শিকারের মরশুম ভালোভাবে কাটানোর আশা করে শুভেচ্ছা বিনিময় করত। ঘোড়াদের মাটিতে পা ঠোকার আওয়াজ আমি অনুভব করতে পারতাম। এই ঘোড়াগুলোতে চড়েই তারা শহর থেকে এখানে এসেছে এবং তাদের বেঁধে রেখেছে গাছের সাথে যেখানে ওগুলো সারা রাত্রি ধরে দাঁড়িয়েছিল, উচ্চস্বরে হ্রেষাধ্বনি করছিল বেরিয়ে পড়ার জন্য অধৈর্য হয়ে। অবশেষে লোকগুলি ঘোড়ায় চাপল এবং যেমন পুরোনো গানে লোকে বলে, দূরে চলে গেল বেগবান অশ্বেরা, লাগামের শব্দে, চাবুকের আঘাতের তীক্ষ্ণ ধ্বনিতে মুখরিত হলো বাতাস, শিকারী কুকুররা ছুটে চলল আগে আগে এবং চলে গেল দক্ষ

www.amarboi.org

শিকারীরা 'পূর্বের কাজে, বিজয় উল্লাসে আর শিকারের ধ্বনিতে!'

সকালে একটু বেলা করে আমরা খোলা জায়গায় বসে ঝলসানো মাংস খাওয়ার প্রস্তুতি নিলাম। একটা গভীর গর্তের তলদেশে আগুন জ্বালানো হলো, বড় বড় শিক গর্তের ওপর আড়াআড়িভাবে রাখা হলো। তারপর ঐ শিকগুলোতে মাংস ঝুলিয়ে দেওয়া হলো এবং পরে শিকে বিঁধে নেওয়া হলো। আগুনের চারপাশে বসেছিল নিগ্রোরা এবং তারা লম্বা গাছের ডাল দিয়ে মাছি তাড়াচ্ছিল। ঝলসানো মাংস থেকে বের হচ্ছিল সেই লোভনীয় গন্ধ যা টেবিলে খাবার সাজানোর আগেই ক্ষুধার্ত করে তুলত আমাকে।

খাবার তৈরিকে ঘিরে চিৎকার এবং উত্তজনা যখন তুঙ্গে, তখনই ধুঁকতে ধুঁকতে দু-তিনজন করে শিকারী এসে হাজির হলো। ঐ লোকগুলি ছিল উত্তপ্ত এবং প্রচণ্ড ক্লান্ত। ঘোড়াগুলোর মুখ ঢেকে গিয়েছিল ফেনায় আর পরিশ্রান্ত শিকারী কুকুরগুলো ছিল বিরক্ত। এত কিছুর পরেও নেই কোনো শিকার! প্রত্যেকেই বলল, সে অন্তত একটা হরিণ দেখেছে এবং এও বলল জন্তুটা খুব কাছেই এসেছিল; কিন্তু যত তীব্রভাবেই কুকুরগুলো শিকারটাকে তাড়া করে থাকুক না কেন, যত ভালোভাবেই বন্দুক তাক করা হয়ে থাক না কেন, বন্দুকের ঘোড়া টেপার পর দৃষ্টিপথে কোনো হরিণই দেখা গেল না। ঐ মানুষগুলি সেই ছোট ছেলেটির মতোই সৌভাগ্যবান ছিল, সে বলেছিল– সে প্রায় একটা খরগোশ দেখে ফেলেছিল– আসলে সে দেখেছিল খরগোশের পায়ের ছাপ। শিকার থেকে ফিরে আসা দলটি অল্প সময়ের মধ্যেই হতাশা কাটিয়ে উঠেছিল এবং বসে পড়েছিল হরিণের মাংস খেতে নয় বরং অতি সাধারণ ভোজ– কচি বাছুরের আর শূয়োরের ঝলসানো মাংস খেতে।

এক গ্রীষ্মে আমার টাট্টু ঘোড়াটাও ছিল ফার্ন কোয়ারিতে। আমি তাকে ডাকতাম 'ব্ল্যাক বিউটি' বলে, কারণ আমি সবেমাত্র ঐ নামের বইটা পড়েছিলাম এবং তার নামের মতোই সব দিক থেকেই তার মিল ছিল ঐ ঘোড়াটার সাথে, তার উজ্জ্বল চকচকে কালো রঙ থেকে শুরু করে তার কপালে থাকা শাদা তারাটা পর্যন্ত। আমি আমার সবচেয়ে সুখের সময়ের অনেকটাই তার পিঠে কাটিয়েছিলাম। কখনও কখনও যখন আমার শিক্ষিকা নিরাপদ বলে মনে করতেন, তখন তিনি ঘোড়াটার লাগাম ছেড়ে দিতেন, তখন ঘোড়াটা হয় অলসভাবে ঘুরে বেড়াত অথবা তার খেয়ালখুশি মতো থেমে পড়ত ঘাস খেতে অথবা আস্তে আস্তে ছিঁড়ে খেত সেই গাছগুলোর পাতা, যে গাছগুলো গজিয়ে থাকত হরিণ বা অন্য কোনো প্রাণীর চলাচলের রাস্তার পাশে।

সেইসব সকালে, যখন আমার ঘোড়ায় চড়ার ইচ্ছে হতো না, তখন আমার শিক্ষিকা এবং আমি সকালের জলখাবার খাওয়ার পর উদ্দেশ্যহীনভাবে বনে ঘুরে বেড়াতাম, গাছপালা আর আঙুরলতার ভিড়ে নিজেদের হারিয়ে ফেলতাম এমন জায়গায় যেখানে গরু আর ঘোড়াদের পায়ে চলাপথ ছাড়া এগিয়ে যাওয়ার কোনো পথ খুঁজে পাওয়া যেত না। প্রায়ই আমরা গিয়ে হাজির হতাম এমন ঝোপ-ঝাড়ের সামনে যা আমাদের বাধ্য করত ঘুরপথ ধরতে। আমরা সবসময়ই কুটিরে ফিরে

www.amarboi.org

আসতাম হাতভর্তি চিরসবুজ লরেল পাতা, গোল্ডেন রড, ফার্ন, অপূর্ব জলজ ফুল নিয়ে। এসব ফুল শুধু দক্ষিণেই জন্মায়।

কখনও কখনও আমি মিলড্রেড এবং আমার ছোট সব জ্ঞাতি ভাইবোনদের সাথে খেজুর কুড়োতে যেতাম। আমি ওগুলো খেতাম না। তবে ওগুলোর গন্ধ পছন্দ করতাম এবং পাতা আর ঘাসের মধ্য থেকে ওগুলোকে খুঁজে বের করে আনন্দ পেতাম।

আমরা বাদাম কুড়োতেও যেতাম এবং আমি আমার সঙ্গীদের ওগুলোর খোসা ছাড়াতে সাহায্য করতাম, ভাঙতাম, হিকারি নাটের খোলা আর আখরোটের খোলা– ওহ্, আখরোটগুলো কী রকম বড় আর কী মিষ্টিই যে ছিল!

পাহাড়ের পাদদেশে ছিল একটা রেলপথ এবং শিশুরা শাঁ শাঁ শব্দে ছুটে যাওয়া রেলগাড়ি দেখত। কখনো কখনো ঘড়ি প্রচণ্ড জোরে বাশি বাজাতে বাজাতে আমাদের সিঁড়ির কাছ দিয়ে যেত এবং মিলড্রেড খুবই উত্তেজিতভাবে আমাকে জানাত যে একটা গরু অথবা ঘোড়া রেললাইনের ওপর উঠে পড়েছে। প্রায় এক মাইল দূরে পথের ওপর একটা গভীর খাদের ওপর একটা সংকীর্ণ সেতু ছিল। ওটার ওপর দিয়ে হাঁটা খুবই কষ্টসাধ্য ছিল কারণ কাঠের বিমগুলো ছিল বেশ দূরে দূরে এবং এত সংকীর্ণ যে কেউ এর ওপর দিয়ে হাঁটলে তার মনে হতো যে, সে যেন ছুরির ওপর দিয়ে হাঁটছে। আমি কোনোদিনই ঐ সেতু পার হইনি যতদিন পর্যন্ত না মিলড্রেড, মিস সুলিভান এবং আমি বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম এবং ঘণ্টা কয়েক উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করেছিলাম পথ খুঁজে না পেয়ে।

হঠাৎ মিলড্রেড তার ছোট্ট হাত তুলে কিছু একটা দেখিয়ে চিৎকার করে উঠেছিল, 'ঐ তো ছোট কাঠের পুলটা!' সম্ভব হলে এই পুলের রাস্তাটা ছেড়ে অন্য কোনো রাস্তাই আমরা বেছে নিতাম; কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল এবং অন্ধকারও হয়ে আসছিল, আর ঐ কাঠের পুলটা দিয়ে যাওয়াই ছিল বাড়ি ফেরার সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথ। আমাকে পা দিয়ে রেললাইন অনুভব করে করে হাঁটতে হচ্ছিল কিন্তু আমি ভয় না পেয়ে বেশ ভালোই এগোচ্ছিলাম। হঠাৎ দূর থেকে ভেসে এল রেলগাড়ির অস্পষ্ট 'হুশ হুশ' শব্দ।

'আমি রেলগাড়িটা দেখতে পাচ্ছি।' চিৎকার করে উঠল মিলড্রেড। আমরা আড়াআড়িভাবে থাকা সাঁকোর নিচের কাঠে নেমে গেলাম। আর এক মিনিট দেরি হলেই রেলগাড়িটা আমাদের ওপর এসে পড়ত। সাথে সাথেই রেলগাড়িটা তীব্রগতিতে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল। আমি ইঞ্জিনের গরম ভাপ অনুভব করেছিলাম মুখে। ইঞ্জিনের ধোঁয়া এবং ছাই আমাদের প্রায় দম আটকে দিয়েছিল। মনে হচ্ছিল– কাঁপুনি আর দুলুনিতে নিচের খাদে গিয়ে পড়ব। বহু কষ্টে আমরা আবার রাস্তায় ফিরে এসেছিলাম। অন্ধকার হওয়ার অনেক পরে আমরা বাড়ি ফিরে দেখলাম বাড়িটা ফাঁকা, কেউ নেই সেখানে; কারণ আমাদের পরিবারের সবাই বেরিয়ে পড়েছিল আমাদের খুঁজতে।

www.amarboi.org

বার

প্রথমবার বস্টন বেড়াতে যাওয়ার পর থেকে প্রায় প্রতি বছর শীতকালটা আমি বস্টনে কাটাতাম। একবার আমি বেড়াতে গিয়েছিলাম ইংল্যান্ডের একটা গ্রামে যেখানে ছিল জল জমে যাওয়া হ্রদ। আর বরফে ঢাকা বিশাল প্রান্তর। এই সময় আমার দুর্লভ সুযোগ হয়েছিল তুষারপাতের সৌন্দর্য দেখার, যা আগে কখনও আমি দেখিনি।

আমি মনে করতে পারি আমার বিস্ময়ের কথা, যখন আমি আবিষ্কার করেছিলাম যে এক বোধাতীত-রহস্যময় হাত রয়েছে গাছদের আর ঝোপদের পাতা ঝরানোর পেছনে। শুধু দু-একটা কুঁকড়ে থাকা পাতা এখানে সেখানে রয়ে গেছে। পাখিরা চলে গিয়েছিল আর নেড়া গাছগুলোর উপরে থাকা তাদের শূন্য বাসাগুলো বরফে ভরেছিল। শীত ছিল পাহাড়ে, প্রান্তরে। মনে হয়েছিল শীতের বরফশীতল স্পর্শে পৃথিবী হয়ে গিয়েছিল অসাড়, অনড়, গাছেদের প্রাণসত্তা নেমে গিয়েছিল তাদের শিকড়ে এবং সেখানে গুটি সুটি মেরে অন্ধকারে তারা আচ্ছন্ন ছিল গভীর ঘুমে। মনে হয়েছিল সমস্ত জীবনসত্তা যেন হারিয়ে গেছে কোনো ভাঁটার টানে, এমনকি সূর্য আলোকিত করেছিল যে দিন, সে দিনটিও ছিল :

সঙ্কুচিত আর শীতল,
যেন তার শিরা উপশিরা রসহীন আর অচল,
এবং সে উঠে দাঁড়িয়েছিল জীর্ণ পোশাকে
দেখে নিতে শেষ ঝাপসা দৃষ্টিতে পৃথিবী আর সমুদ্রকে।

শুকিয়ে যাওয়া ঘাস-এর শুকনো ঝোপ-ঝাড় পরিবর্তিত হয়েছিল ঘরের ছাঁচের কোণা থেকে প্রলম্বিত জমাট-বাঁধা তুষারে।

তারপর এলো একটা দিন, যখন হিমেল হাওয়া পূর্বাভাস দিল তুষারঝড়ের। আমরা সকলে ঘরের বাইরে ছুটে চলে এলাম। অনুভব করলাম প্রথম নেমে আসা কয়েকটা তুষারকণাকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছোট ছোট তুষারকণা ঝরে পড়তে থাকল নিঃশব্দে আর আলতো, নরমভাবে– তাদের বাতাসের উচ্চতা থেকে পৃথিবীর বুকে আর বিশ্বচরাচর পৃথিবীটা একই রকম সমতল হয়ে আসতে থাকল। একটা তুষারঝরা রাত্রি নেমে এলো পৃথিবীর বুকে আর সকালে প্রাকৃতিক দৃশ্য এমনই হয়েছিল যে কোনো কিছুর বৈশিষ্ট্য আলাদাভাবে চেনারই উপায় থাকল না। সব রাস্তা হারিয়ে গিয়েছিল বরফের নিচে, একটা বিশেষ চিহ্নও দেখা যাচ্ছিল না। তার মাঝেই বিস্তৃত তুষারের স্তূপ ভেদ করে দাঁড়িয়েছিল কিছু গাছ।

সন্ধ্যায় উত্তর-পূর্ব দিক থেকে একটা ঝড় যেন লাফিয়ে উঠে এলো; আর বরফ কুচিগুলো সেই তীব্র বিশৃঙ্খলার মধ্যে ছিটকে পড়তে লাগল এদিক ওদিক। একটা বড় আগুনের চারপাশে আমরা বসে মজাদার গল্প আর হাসি-মস্করায় মেতে উঠলাম

www.amarboi.org

এবং একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম যে আমরা রয়েছি পরিত্যক্ত, নিঃসঙ্গ, বাইরের পৃথিবীর সাথে যোগসূত্রহীন একটা স্থানে। কিন্তু রাতের দিকে ঝড়ের তাণ্ডব এত বেড়ে গিয়েছিল যে তা আমাদের অজানা আতঙ্কে রোমাঞ্চিত করেছিল। ঘরের চালের ঢালু বরগায় ফাটল ধরল এবং ওটা ভেঙে পড়ার উপক্রম হলো; আর বাড়ির চারপাশে যে গাছগুলো ছিল সেগুলো গড়গড় শব্দ সৃষ্টি করছিল, আছড়ে পড়ছিল জানালার ওপর। বাতাস তখন উন্মত্ত হয়ে বয়ে যাচ্ছিল সমস্ত অঞ্চলের ওপর দিয়ে।

আরম্ভ হওয়ার তৃতীয় দিনে ঝড় আর তুষারপাত বন্ধ হয়েছিল। সূর্য মেঘের বুক চিরে ঢেউ খেলানো বিশাল প্রান্তরে উজ্জ্বল কিরণ ছড়িয়ে দিচ্ছিল। বরফের উঁচু উঁচু স্তূপ, কল্পনার অতীত আকারে তৈরি সব পিরামিড, অভেদ্য সমপ্রপাত– সব বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিল চারদিকে।

বরফের মধ্যে দিয়ে কোদাল চালিয়ে সরু পথ কাটা হলো। আমি আমার ঢিলা কোট এবং মাথা ঢাকা টুপি পরে বেরিয়ে পড়েছিলাম। হিমেল বাতাস আগুনের ফুলকির মতো আমার গালে হুলের মতো ফুটতে লাগল। অর্ধেকটা রাস্তা হেঁটে, আর অর্ধেকটা কম রবফজমা জায়গার ভিতর দিয়ে গিয়ে আমরা পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলাম একটা পাইন বনের কাছে, যেটা ছিল বিশাল চারণভূমির বাইরে। গাছগুলো দাঁড়িয়েছিল নিশ্চল হয়ে, মনে হচ্ছিল ওগুলো যেন সাদা মার্বেল পাথরের ওপর কারুকার্য করা। কিন্তু পাইনগাছের পাতার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল না। সূর্যের রশ্মি ছড়িয়ে পড়েছিল গাছগুলোর ওপর যার ফলে কচি পাতাগুলো ঝকমক করছিল হীরের মতো, আর যখনই আমরা সেগুলো স্পর্শ করছিলাম, তখনই বরফের কুচিগুলো ঝরে পড়ছিল বৃষ্টি ঝরার মতো। এমনই চোখ ঝলসানো ছিল সেই দ্যুতি, যে অন্ধকার আমার চোখকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রেখেছিল তার পর্দা ভেদ করে আমার চোখে এসে পড়ছিল।

কয়েকদিন কাটার পর বরফের বড় খণ্ডগুলো ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হতে থাকল, কিন্তু তারা সম্পূর্ণ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই আর একটা ঝড় এলো। এর ফলে সেবার সারা শীতকাল পায়ের তলায় মাটির স্পর্শ প্রায় অনুভবই করতে পারিনি। কিছু সময় পর পর গাছগুলো তাদের তুষারের আবরণ হারিয়ে ফেলত, নলখাগড়া জাতীয় জলজ উদ্ভিদ এবং ছোট গাছের ঝোপ তাদের বরফের চাদর থেকে মুক্ত হতো। কিন্তু হ্রদের জল শক্ত হয়ে জমে থাকত সূর্যালোকেও।

শীতকালে আমাদের প্রিয় বিনোদন ছিল স্লেজ গাড়িতে চড়ে বরফের ঢাল বেয়ে নামা। কোথাও কোথাও হঠাৎই খানিকটা উঁচুতে জলের ধার থেকে হ্রদের পাড় দেখা যেত। ঐ খাড়া পাড় থেকে আমরা স্লেজ গাড়িতে চড়ে নামতাম। আমরা আমাদের স্লেজ গাড়িতে বসে থাকতাম। একটা ছেলে ঠেলা দিত, আর আমরা গড়িয়ে যেতাম। বরফখণ্ডের মধ্যে দিয়ে এগোতে এগোতে, শূন্যে লাফিয়ে নিচে হ্রদের ওপর পড়ে তার মসৃণ উপরিভাগে দ্রুত গতিতে ছিটকে হ্রদের অন্য পাড়ে পৌঁছে যেতাম। কী যে আনন্দ ছিল! কী আনন্দদায়ক ছিল সেই খ্যাপামি! একটা আদিম অকৃত্রিম আনন্দের মুহূর্তের জন্য মাটির সাথের যোগসূত্রটা আমরা ছিন্ন করেছিলাম এবং ঝড়ের সাথে হাত মিলিয়ে আমরা নিজেদের মনে স্বর্গীয় আনন্দ অনুভব করতাম!

www.amarboi.org

তের

সেটা ছিল ১৮৯০ সালের বসন্তকাল। তখন আমি কথা বলতে শিখেছিলাম। শ্রবণসাধ্য উচ্চারণ করার প্রেরণা সব সময়ই প্রবল ছিল আমার মধ্যে। আমি প্রায়ই শব্দ করতাম একটা হাত আমার কণ্ঠনালীতে রেখে, আর অন্য হাতটা অনুভব করত আমার ঠোঁটের নড়াচড়া। আমি খুশি হতাম সেই ধরনের কিছুতে, যা শব্দ সৃষ্টি করত এবং আমি পছন্দ করতাম বিড়ালের গর গর আওয়াজ এবং কুকুরের ঘেউ ঘেউ। গান গাওয়ার সময় গায়কের কণ্ঠনালীতে হাত রাখতে পছন্দ করতাম আমি, অথবা পিয়ানোর ওপর, যখন সেটা বাজানো হতো। আমি আমার দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রবণক্ষমতা হারানোর আগে দ্রুত কথা বলতে শিখছিলাম, কিন্তু আমার অসুস্থতার পর দেখা গেল আমার কথা বলা বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ আমি শুনতে পেতাম না। সারাদিন মায়ের কোলে শুয়ে মায়ের মুখে হাত রাখতাম কারণ তাঁর ঠোঁটের নড়াচড়ার অনুভব আমাকে আনন্দ দিত। আমি আমার ঠোঁটও নাড়তাম যদিও কথা বলা কী তা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আমার বন্ধুরা বলে, আমি হাসতাম এবং কাঁদতাম স্বাভাবিকভাবেই এবং কিছু সময়ের জন্য আমি অনেক শব্দ এবং শব্দাংশ উচ্চারণ করতাম, এই কারণে নয় যে ওগুলো যোগাযোগের মাধ্যম, বরং আমার স্বরতন্ত্রীর ব্যবহার করা ছিল খুবই জরুরি। যা হোক, একটা শব্দ ছিল, যার অর্থ আমি তখনও মনে রেখেছিলাম, শব্দটা হলো, 'ওয়াটার' মানে পানি। আমি ঐ শব্দটা উচ্চারণ করতাম 'ওয়া ওয়া' বলে, ওটাও শেষ পর্যন্ত দুর্বোধ্য হয়ে আসতে থাকল সেইসময় পর্যন্ত, যখন মিস সুলিভান আমাকে পড়াতে আরম্ভ করেছিলেন। আমি এটা ব্যবহার করা বন্ধ করেছিলাম শব্দের বানান আঙুলের ওপর লিখতে শেখার পর।

আমি অনেকদিন ধরেই জানতাম যে, আমার চারপাশে যে লোকজনেরা আছে তারা ব্যবহার করত ভাবের আদান-প্রদানের একটা প্রণালি। এটা ছিল আমার থেকে ভিন্ন ধরনের। একজন বধির শিশুকেও যে কথা বলা শিক্ষা দেওয়া সম্ভব এই ব্যাপারটা জানার আগেই কিন্তু আমি সচেতন ছিলাম আমার অসন্তোষ সম্বন্ধে– যা ছিল সেই যোগাযোগের উপায় সম্বন্ধে যেটা তখন আমার আয়ত্তে ছিল। যে মূকবধিরদের শিক্ষার জন্য থাকা বর্ণমালার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, তার মধ্যে সব সময়ই একটা সংযম, একটা সংকীর্ণতার ভাব কাজ করে। এই অনুভব আমাকে বিক্ষুব্ধ করতে শুরু করল, বিরক্ত করতে শুরু করল একটা গভীর অক্ষমতা– অভাববোধ, যা পূর্ণ হওয়া উচিত। মাঝে মাঝে আমার চিন্তাগুলো জেগে উঠত, ঊর্ধ্বগামী হতো পাখিদের মতো এবং বাতাসের বিরুদ্ধে ঝাপটাত ডানা, আর আমি অধ্যবসায়ের সাথে চালিয়ে যেতাম ঠোঁট এবং কণ্ঠস্বরের ব্যবহার। বন্ধু, শুভানুধ্যায়ীরা চেষ্টা করত আমার এই প্রবণতাকে নিরুৎসাহ করতে, এই ভয়ে যে পাছে না ওটা

www.amarboi.org

নিরাশায় পরিণত হয়। কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা। আমার প্রচেষ্টা আমি চালিয়ে যেতে থাকলাম, এবং একটা দুর্ঘটনা ঘটল অনতিবিলম্বেই, যার ফলে ভেঙে পড়ল সব বাধা, বিপত্তি, প্রতিবন্ধকতা– আমি শুনলাম 'রাগন্‌হিল্ড কাটার' কাহিনী।

১৮৯০ সালে মিসেস ল্যামসন, যিনি ছিলেন 'লরা ব্রিজম্যান' এর শিক্ষিকাদের একজন এবং যিনি সবে মাত্র নরওয়ে এবং সুইডেন থেকে বেড়িয়ে ফিরেছিলেন। তিনি দেখা করতে এলেন আমার সাথে। উনিই আমাকে বলেছিলেন 'রাগন্‌হিল্ড কাটার' সম্বন্ধে, যে ছিল নরওয়ের একটি মূকবধির ও অন্ধ মেয়ে, যাকে সত্যি সত্যি কথা বলা শেখানো হয়েছিল। মিসেস ল্যামসন মেয়েটির সাফল্য সম্বন্ধে বলা শেষ করার আগেই আমি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিলাম উৎসাহে। আমি সংকল্প করলাম যে, আমিও কথা বলতে শিখব। কথা বলা আয়ত্ত করা সম্ভব এটা অনুভব করার পর, আমি স্থির বা তৃপ্ত থাকতে রাজি হইনি, যতক্ষণ না আমার শিক্ষিকা কথা বলতে শেখার ব্যাপারে পরামর্শ এবং সাহায্য পাওয়ার জন্য আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন মিস সারা ফুলারের কাছে। তিনি ছিলেন 'হোরেস মান স্কুলের' অধ্যক্ষ। এই অতীব সুন্দরী মধুর স্বভাবের সম্ভ্রান্তা মহিলা নিজেই আমাকে 'কথা বলা' শিক্ষা দিতে রাজি হয়েছিলেন এবং আমরা পঠন-পাঠনের কাজটা শুরু করেছিলাম ২৬ মার্চ, ১৮৯০ সালে।

মিস ফুলারের শেখানোর পদ্ধতি ছিল এরকম : তিনি আমার হাতটা আলতোভাবে তাঁর মুখমণ্ডলের ওপর বোলাতেন এবং যখন তিনি কোনো শব্দ করতেন আমাকে তাঁর জিভ ও ঠোঁটের অবস্থান অনুভব করতে দিতেন। যে কোনো বলার ধরন অনুকরণ করতে আমি আগ্রহী ছিলাম এবং এক ঘণ্টায় বাক প্রণালির ছ'টা উপাদান ম, প, আ, স, ট, ই শিখেছিলাম। মিস ফুলার আমাকে সর্বমোট এগারোটা পাঠ দিয়েছিলেন। আমি কখনওই ভুলব না সেই বিস্ময় এবং আনন্দ যা আমি অনুভব করেছিলাম যখন আমি আমার প্রথম সুগঠিত বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলাম। এটা সত্যি যে সেগুলো ছিল ভাঙা ভাঙা বাক্যাংশ এবং তোতলানো শব্দাংশ, কিন্তু সেগুলো ছিল মানুষেরই ভাষা। আমার অন্তরাত্মা সচেতন হয়ে উঠেছিল এক নতুন শক্তি সম্পর্কে। এ শক্তি মুক্তি পেয়েছিল দাসত্ব থেকে এবং ভাষার ঐ ভাঙা ভাঙা সঙ্কেতগুলোর মধ্যে দিয়ে সমস্ত জ্ঞান এবং বিশ্বাসে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিল।

কোনো বধির শিশু, যে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছে উচ্চারণ করতে সেই শব্দ, যা সে কখনও শোনেনি– চেষ্টা করেছে সেই নৈঃশব্দের কারাগার থেকে বেরিয়ে আসতে, যেখানে নেই ভালোবাসার সুর, নেই পাখির গান, কোনো সংগীতের মূর্ছনা ভেদ করতে পারেনি সেই নীরবতাকে– সে ভুলতে পারে কি সেই রোমাঞ্চকর বিস্ময়, আবিষ্কারের আনন্দ যা দেখা দিয়েছিল তার মধ্যে, যখন সে উচ্চারণ করেছিল প্রথম শব্দটি। শুধু সেই রকম একজনই পারে অনুভব করতে সেই আগ্রহ, যা নিয়ে আমি কথা বলতাম আমার পুতুলগুলোর সাথে, পাথরের সাথে, গাছের সাথে, পাখিদের সাথে, অবলা জীবদের সাথে, অথবা যে আনন্দ আমি অনুভব করতাম যখন আমার

www.amarboi.org

ডাকে মিলড্রেড ছুটে আসত আমার কাছে অথবা আমার কুকুরেরা যখন পালন করত আমার আদেশ। কথা বলতে পারা ছিল আমার কাছে এক অনির্বচনীয় আশীর্বাদ যার ফলে আমি সক্ষম হয়েছিলাম ডানাযুক্ত শব্দের মাধ্যমে কথা বলতে, যেখানে প্রয়োজন হতো না কোনো ব্যাখ্যার। যখন আমি কথা বলতাম, তখন সুখকর চিন্তারা যেন আমার শব্দগুলো থেকে ডানা ঝাপটে ওপরে উঠে যেত যেগুলো সম্ভবত মুক্তি পেতে আমার আঙুলগুলো থেকে ব্যর্থ সংগ্রাম করেছিল।

কিন্তু এটা ভাবা ঠিক হবে না যে, আমি সত্যি সত্যি কথা বলতে পেরেছিলাম এই অল্প সময়ের মধ্যে। আমি শিখেছিলাম শুধুমাত্র কথা বলার প্রাথমিক সূত্রগুলো। মিস ফুলার এবং মিস সুলিভান আমার কথা বুঝতে পারতেন, কিন্তু বেশির ভাগ মানুষ একশটা শব্দের মধ্যে একটা শব্দকে বুঝতে পারতো না। আবার এটাও সত্যি নয় যে, সূত্রগুলো শেখার পর আমি আমার কাজের বাকি অংশ নিজে নিজে করতে শিখেছিলাম। মিস সুলিভানের প্রতিভা, অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং নিষ্ঠা ছাড়া আমি স্বাভাবিকভাবে কথা বলার দিকে যতটা এগোতে পেরেছিলাম, ততটা আমি এগোতে পারতাম না। প্রথমত, আমি রাতদিন পরিশ্রম করতাম যাতে আমার সব থেকে ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা আমার কথা বুঝতে পারে। দ্বিতীয়ত, আমার প্রচেষ্টায় মিস সুলিভানের অবিরাম সাহায্য প্রয়োজন ছিল, যাতে আমি প্রতিটা শব্দ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে পারি এবং সব ধ্বনিকে হাজার রকমে সংযুক্ত করতে পারি। এখনও প্রতিদিন তিনি আমার প্রতিটি ভুলভাবে উচ্চারিত শব্দের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বধিরদের সব শিক্ষকরাই জানেন এটার অর্থ কী এবং শুধু তাঁরাই অনুভব করতে পারেন কী অদ্ভুত ধরনের অসুবিধার বিরুদ্ধে আমাকে লড়াই করতে হয়েছিল। আমার শিক্ষিকার ঠোঁটের ভাষা পড়ার জন্য আমাকে পুরোপুরি নির্ভর করতে হয়েছে আমার আঙুলগুলোর ওপর : আমাকে ব্যবহার করতে হয়েছিল স্পর্শচেতনা, কণ্ঠের কম্পন অনুভব করতে, মুখের নড়াচড়া ও মুখমণ্ডলের অভিব্যক্তি বুঝতে এবং প্রায়ই এই চেতনা ভুল করে ফেলত। ও রকম সময় আমি বাধ্য হতাম শব্দগুলো এবং বাক্যগুলো বারবার উচ্চারণ করতে, কখনও কখনও ঐ অনুশীলন চলত ঘণ্টার পর ঘণ্টা, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি সেই শব্দগুলো অথবা বাক্যগুলো আমার কণ্ঠে সঠিকভাবে ধ্বনিত হয়েছে বলে মনে করতাম। আমার নিজের কাজ ছিল : অনুশীলন, অনুশীলন আর অনুশীলন। প্রায়ই, নিরুৎসাহ আর ক্লান্তি আমাকে ভেঙে পড়তে বাধ্য করত; কিন্তু পরক্ষণেই আমার মনে হতো কিছুক্ষণের মধ্যে বাড়ি ফিরব এবং আমার প্রিয়জনদের দেখাতে পারব কী সফলতা আমি অর্জন করেছি, এই চিন্তা আমাকে অনুপ্রাণিত করত এবং আমি গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতাম আমার সাফল্যে তাঁদের উৎফুল্লতা দেখার জন্য।

'আমার ছোট বোন এখন আমার কথা বুঝতে পারবে', সকল বাধার চেয়ে এমন একটা ভাবনা, যা শক্তিশালী ছিল। আনন্দের উচ্ছ্বাসে আমি প্রায়ই এই কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করতাম, 'আমি এখন আর বোবা নই।' আমি আর হতাশ থাকতে পারতাম

www.amarboi.org

না যখন আমি আমার মায়ের সাথে কথা বলার আনন্দের কথা অনুমান করতাম এবং তাঁর ঠোঁটের স্পর্শ থেকে তাঁর উত্তর পড়ে নিতাম। এটা আমাকে বিস্মিত করত যখন আমি ভাবতাম আঙুল দিয়ে বানান করে মনের ভাব প্রকাশ করার চেয়ে কথা বলা কত সহজ। এরপর থেকে মূক ও বধিরদের জন্য নির্দ্দিষ্ট বর্ণমালা যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে বাতিল করে দিয়েছিলাম। কিন্তু মিস সুলিভান এবং কয়েকজন বন্ধু এখনো ঐ বর্ণমালা ব্যবহার করে আমার সাথে কথা বলেন; কারণ, ঠোঁট নাড়ার মাধ্যমে ভাবের আদান প্রদানের চেয়ে এটা অনেক বেশি সুবিধাজনক ও দ্রুত করা যায়।

আমাদের মতো মূক ও বধিরদের জন্য নির্দিষ্ট বর্ণমালা কীভাবে ব্যবহার করা হয় তা বললে, ধাঁধায় ফেলে সেই সব মানুষদের, যারা আমাদের সম্বন্ধে জানে না। যিনি আমাকে কিছু পড়ে শোনান, অথবা আমার সাথে কথা বলেন, তিনি তা করেন হাত দিয়ে বানান করে, এক হাতে ব্যবহার করা যায় এমন বর্ণমালা, যা সাধারনত বধিররা ব্যবহার করে। কথা বলার সময় আমি আমার হাত বক্তার হাতের ওপর এত আলতো করে রাখি যাতে হাতের সঞ্চালন বাধাপ্রাপ্ত না হয়। হাতের অবস্থান অনুভব করা দেখার মতোই সহজ। তোমরা পড়ার সময় প্রত্যেকটি বর্ণকে আলাদাভাবে যতবার দেখ, আমি পড়ার সময় বর্ণমালার বর্ণগুলোকে তার চেয়ে বেশিবার অনুভব করি না। নিরবচ্ছিন্ন অভ্যাস, হাতের আঙুলগুলোকে করে অত্যন্ত নমনীয়, এবং আমার বন্ধুদের কয়েকজন খুবই দ্রুততার সাথে বানান করতে পারে– বলতে গেলে প্রায় একজন দক্ষ 'টাইপিস্ট' টাইপরাইটারে যত তাড়াতাড়ি লেখে, ততটা দ্রুততার সাথেই। শুধুমাত্র বানান করা, অবশ্যই লেখার চেয়ে বেশি সচেতন প্রয়াস নয়।

যখন আমি বাক্‌শক্তিকে নিজের করে নিতে পারলাম অর্থাৎ কথা বলা আয়ত্ত করতে পারলাম, তখন বাড়ি যাওয়ার দেরি সহ্য করতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে আনন্দময় মুহূর্ত এসে উপস্থিত হলো। আমি বাড়ি ফেরার সময় মিস সুলিভানের সাথে অনর্গল কথা বলেছিলাম, সেটা শুধু কথা বলার জন্য নয়, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার কথা বলার ক্ষমতা যতটা সম্ভব বেশি উন্নত করতে। কিন্তু কিছু বুঝে ওঠার আগেই রেলগাড়ি তাসকাম্বিয়া স্টেশানে গিয়ে থামল এবং ওখানে প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়েছিল আমার পরিবারের সবাই। আমার চোখ জলে ভরে ওঠে এখনও, যখন আমি ভাবি, আমার মা কেমনভাবে আমাকে তাঁর বুকের কাছে চেপে ধরেছিলেন, তিনি নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন এবং আনন্দে কাঁপছিলেন। তিনি আমার বলা প্রতিটি শব্দাংশ উপলব্ধি করছিলেন আর ছোট্ট মিলড্রেড আমার মুক্ত হাতটা সাগ্রহে অধিকার করে চুম্বন করেছিল এবং নাচছিল, আর আমার বাবা সম্পূর্ণ নীরব থেকে প্রকাশ করেছিলেন তাঁর গর্ব এবং স্নেহ। এটা যেন আমার মধ্যে ইসাইয়া-র ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হয়ে ওঠা; 'পর্বতগুলো এবং পাহাড়গুলো ভেঙে পড়বে তোমার সামনে সঙ্গীতের মূর্ছনায়, আর মাঠের গাছগুলো দেবে করতালি।'

www.amarboi.org

চৌদ্দ

১৮৯২ সালের শীতকাল অন্ধকারে আচ্ছন্ন করেছিল আমার শৈশব জীবনের উজ্জ্বল আকাশ। আনন্দ আমাকে পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিল এবং অনেক দীর্ঘ সময় আমি বাস করছিলাম সন্দেহ, উদ্বেগ আর আতঙ্কের মধ্যে। বইগুলো তাদের মায়াময় আকর্ষণ হারিয়েছিল আমার কাছে। এমনকি এখনও ঐ ভয়ঙ্কর দিনগুলোর চিন্তা নিরুৎসাহিত করে আমার হৃদয়কে। একটা ছোট্ট গল্প, যার নাম, 'দ্য ফ্রস্ট কিং' যেটা আমি লিখে পাঠিয়েছিলাম পারকিন্স ইনস্টিটিউশন ফর ব্লাইন্ড-এর মি. অ্যানাগ্নসকে, সেটাই ছিল আমার বিপত্তির মূলে। ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বোঝানোর জন্য আমি ব্যাখ্যা করব এই কাহিনীর সাথে যুক্ত প্রকৃত ঘটনাগুলো যা আমার শিক্ষিকা এবং আমার নিজের প্রতি সুবিচার করার জন্য আমাকে বর্ণনা করতে বাধ্য করছে।

কথা বলতে শেখার পর আমি এই গল্পটা লিখেছিলাম যখন আমি শরৎকালে বাড়িতে ছিলাম। আমরা সে বার ফার্ন কোয়ারিতে বেশিদিন ছিলাম। আমরা যখন ওখানে ছিলাম, মিস সুলিভান আমার কাছে দেরিতে আসা বৃক্ষপত্রগুলোর সৌন্দর্য বর্ণনা করেছিলেন এবং আমার মনে হয় যে, তাঁর দেওয়া বর্ণনা একটা গল্পকে স্মৃতিতে উত্থাপিত করেছিল যা নিশ্চয়ই আমাকে পড়ে শোনানো হয়েছিল এবং নিশ্চয়ই আমি তাকে অবচেতন করে রেখেছিলাম। আমি তখন ভেবেছিলাম যে আমি 'একটা গল্প তৈরি করছি' যেমন শিশুরা বলে থাকে এবং আমি অত্যন্ত আগ্রহের নিয়ে লিখতে বসে গিয়েছিলাম যাতে চিন্তাটা আমার কাছ থেকে হারিয়ে না যায়। আমার চিন্তাগুলো প্রবাহিত হচ্ছিল সহজ গতিতে। ঐ লেখাটা লিখতে গিয়ে আমি আনন্দ অনুভব করছিলাম। শব্দ ও চিত্রকল্পগুলো দ্রুত চলে আসছিল আমার আঙ্গুলের ডগায় এবং আমি বাক্যের পর বাক্য চিন্তা করে নিচ্ছিলাম এবং সেগুলোকে লিখছিলাম আমার ব্রেইল শ্লেটে। এখন যদি বহু শব্দ এবং চিত্রকল্পগুলো বিনা চেষ্টায় আমার কাছে এসে হাজির হয়, তবে তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, তারা আমার মনোজাত সন্তান নয়, পরিত্যক্ত কতগুলো শিশুমাত্র যাদের আমি দুঃখের সাথে খারিজ করেছি। সেই সময় আমি যা কিছু পড়তাম, গ্রন্থকারের চিন্তা না করেই তা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে আত্মস্থ করে নিতাম এবং এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারি না, আমার চিন্তা এবং বই-এ যে চিন্তা পাই তার মাঝখানের সীমারেখা সম্বন্ধে। আমার ধারণা এটা হয় এ কারণে যে আমার বহু ধারণা আমার কাছে আসে অপরের চোখ এবং কানের মাধ্যমে।

গল্পটা লেখার পর আমার শিক্ষিকাকে পড়ে শুনিয়েছিলাম এবং তখন স্পষ্টভাবে মনে করতে পারি সেই আনন্দ যা আমি বেশি আকর্ষণীয় অনুচ্ছেদগুলো পড়ার সময়

www.amarboi.org

পেয়েছিলাম। আমি অসন্তোষ প্রকাশ করতাম যখন আমার শিক্ষিকা উচ্চারণ শুদ্ধ করার জন্য পড়ার মাঝে আমাকে থামিয়ে দিতেন। রাতে খাবার সময় গল্পটা পড়া হয়েছিল বাড়ির লোকদের জমায়েতে যাঁরা সেখানে ছিলেন তাঁরা অবাক হয়েছিলেন এই ভেবে যে আমি এত ভালো লিখতে পারি। কেউ একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি ঐ গল্পটা কোনো বই-এ পড়েছি কি না।

এই প্রশ্ন আমাকে অবাক করেছিল; কারণ আমার অস্পষ্ট কোনো স্মৃতিও ছিল না, যে আমাকে কেউ গল্পটা পড়ে শুনিয়েছে। আমি চেঁচিয়ে উঠে বলেছিলাম, 'ওহো, না, এটা আমার গল্প এবং এটা আমি লিখেছি মি. অ্যানাগ্‌নসের জন্য।'

অতএব আমি গল্পটা নকল করে লিখলাম এবং ওটা তাঁকে পাঠালাম জন্মদিনের উপহার হিসাবে। আমাকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে আমি যেন গল্পের নামটা 'অটাম লীভ্‌স্' থেকে 'দ্য ফ্রস্ট কিং'-এ পরিবর্তন করি এবং ওটা আমি করেছিলাম। আমি ছোট্ট গল্পটা ডাকঘরে বয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম নিজেই, আনন্দে মনে হচ্ছিল যেন বাতাসের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি আমি। তখন স্বপ্নেও ভাবিনি যে কী নিষ্ঠুরভাবে আমাকে খেসারত দিতে হবে জন্মদিনের ঐ উপহারটার জন্য।

মি. অ্যানাগ্‌নস খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন 'দ্য ফ্রস্ট কিং' পেয়ে। তিনি ওটা প্রকাশ করেছিলেন পারকিনস্ ইনস্টিটিউশনের বুলেটিন-এর একটা সংখ্যায়। এটা ছিল আমার আনন্দের সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে যাওয়া। যে উচ্চতা থেকে আমি অল্প কিছুকাল পর আছড়ে পড়েছিলাম বাস্তবতার মাটিতে। আমি বস্টনে ছিলাম অল্প সময়ের জন্য। তখনই আবিষ্কৃত হয়েছিল যে 'দ্য ফ্রস্ট কিং' গল্পটি মিস মার্গারেট টি ক্যানবি লিখিত 'দ্য ফ্রস্ট ফেয়ারিজ'-এর অনুরূপ একটা গল্প। আমার জন্মের আগে লেখা বই 'বারডি অ্যান্ড হিজ ফ্রেন্ড্‌স্' এ প্রকাশিত হয়েছিল গল্পটা। দুটো গল্প ভাব এবং ভাষার দিক থেকে এতটাই মিল ছিল যে এটা স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল মিস ক্যানবির গল্পটা পড়ে শোনানো হয়েছিল আমাকে এবং আমার গল্পটা একটা সাহিত্যিক জালিয়াতি। এটা খুবই কষ্টসাধ্য ছিল আমাকে বোঝান; কিন্তু সত্যিই ব্যাপারটা যখন বুঝতে পারলাম আমি বিস্মিত হয়েছিলাম এবং দুঃখও পেয়েছিলাম। কোনো শিশু কখনও এর চেয়ে বেশি তিক্ততার পেয়ালা পান করেনি যা আমাকে পান করতে হয়েছিল। আমি নিজেকে অপমান তো করেই ছিলাম সাথে সাথে আমি নিচে নামিয়ে ছিলাম সেই সকল মানুষদের যাদের আমি ভালোবাসতাম সবচেয়ে বেশি। তবুও আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না কীভাবে ঘটনাটা ঘটা সম্ভব হয়েছিল। আমি ঐ ব্যাপারটা মনে করার জন্য মাথা ঘামিয়েছিলাম, যতক্ষণ না তুষার সংক্রান্ত কিছু মনে করার চেষ্টা করে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। ওটা আমি পড়েছিলাম 'দ্য ফ্রস্ট কিং' লেখার আগে। কিন্তু আমি কিছুই মনে করতে পারিনি এটুকু ছাড়া যা ছিল জ্যাক ফ্রস্ট সম্বন্ধে সাধারণ প্রসঙ্গ এবং ছোটদের জন্য লেখা একটা কবিতা : 'দ্য ফ্রীকস্ অফ দ্য ফ্রস্ট' এবং আমি জানতাম, তা আমি ব্যবহার করিনি আমার রচনায়।

www.amarboi.org

প্রথম দিকে মি. অ্যানাগ্‌নস বেশ বিব্রত বোধ করলেও, মনে হয় আমাকে বিশ্বাস করেছিলেন। তিনি যেন অস্বাভাবিক মাত্রায় নরম ও স্নেহশীল হয়ে পড়েছিলেন এবং অল্প সময়ের জন্য আমার মনে বিষাদের যে ছায়া পড়েছিল, তা মুছে গিয়েছিল। তাঁকে খুশি করার জন্য, আমি অসুখী না থাকার চেষ্টা করেছিলাম। ওয়াশিংটনের জন্মদিন পালন উপলক্ষে নিজেকে যতদূর সম্ভব মনোরম করে তুলেছিলাম। জন্মদিন পালিত হয়েছিল আমি দুঃসংবাদটি পাওয়ার অল্প পরেই।

আমার অভিনয় করার কথা ছিল 'সেরেস'-এর ভূমিকায় এক ধরনের 'মাস্‌ক্'-এ যা উপস্থাপন করার কথা ছিল অন্ধ বালিকাদের। কী পরিষ্কার ভাবেই না আমি মনে করতে পারি, কী অপূর্ব পোশাকে আমাকে সাজানো হয়েছিল, শরতের উজ্জ্বল পাতায় সাজানো হয়েছিল আমার মাথা, এবং ফল আর শস্য দিয়ে সাজানো হয়েছিল আমার পা দুটি; হাত দুটি এবং আর মাস্‌ক্-এর এই ধার্মিকতার আড়ালে একটা অশুভের আগমনের পীড়নকারী অনুভূতি আমার মনকে করেছিল নিরানন্দ, ভারী।

অনুষ্ঠানের আগের দিন রাত্রে ইনস্টিটিউশানের একজন শিক্ষিকা আমাকে একটা প্রশ্ন করেছিলেন। সেটা যুক্ত ছিল 'দ্য ফ্রস্ট কিং'-এর সাথে। আমি তাঁকে বলেছিলাম মিস সুলিভান গল্প করেছিলেন আমার কাছে জ্যাক ফ্রস্ট এবং তার অপূর্ব শিল্পকর্ম সম্বন্ধে। আমি এমন কিছু বলেছিলাম যা থেকে তিনি স্বীকারোক্তি পেয়েছিলেন যে আমি অবশ্যই মিস ক্যানবির গল্প, 'দ্য ফ্রস্ট ফেয়ারিজ' মনে রেখেছিলাম, এবং তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত মি. অ্যানাগ্‌নস-এর কাছে পেশ করেছিলেন, যদিও আমি তাঁকে অত্যন্ত জোরের সাথে বলেছিলাম যে তিনি ভুল বুঝেছিলেন।

মি. অ্যানাগ্‌নস, যিনি আমাকে সহানুভূতিপূর্ণ মন নিয়ে ভালোবাসতেন, তিনি প্রতারিত হয়েছেন এই ভেবে আমার ভালোবাসাপূর্ণ মিনতি এবং নির্দোষিতার অনুনয়ের দিকে কান দিলেন না। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন, না হলে অন্তত সন্দেহ করেছিলেন যে, মিস সুলিভান এবং আমি সচেতনভাবে চুরি করেছিলাম অপর একজনের একটা উজ্জ্বল ও চমৎকার চিন্তা এবং তা দিয়ে তাঁকে প্রতারণা করে তাঁর প্রশংসা অর্জন করতে চেয়েছিলাম। আমাকে হাজির করা হয়েছিল একটা তদন্তকারী বিচার সভার সামনে। এই কমিটি গঠিত হয়েছিল বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং কর্মকর্তাদের নিয়ে এবং মিস সুলিভানকে বলা হয়েছিল আমাকে ছেড়ে যেতে। তারপর আমাকে এমনভাবে প্রশ্ন করা হয়েছিল এবং জেরা করা হয়েছিল, আমার মনে হয়েছিল, বিচারকরা দৃঢ় সংকল্প করেছিলেন যে আমাকে একথা স্বীকার করতে বাধ্য করা হবে; অন্তত একথা স্বীকার করানোর চেষ্টা করানো হবে যে, আমাকে 'দ্য ফ্রস্ট ফেয়ারিজ' পড়ে শোনানো হয়েছিল। প্রতিটি প্রশ্ন করার মধ্যে তাঁদের মনে একটা অবিশ্বাস এবং সন্দেহের ভাব অনুভব করছিলাম; বরং এটাও অনুভব করছিলাম যে আমার একজন প্রিয় বন্ধু আমাকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে লক্ষ করছেন, যদিও সে অভিজ্ঞতার কথা আমি শব্দ ব্যবহার করে বোঝাতে পারব না। আমার রক্তে অস্বাভাবিকভাবে চাপ বাড়তে থাকল আমি প্রায় কথাই বলতে পারছিলাম না। এমন

www.amarboi.org

কী সেই উপলব্ধি, যা ছিল একটা ভয়ঙ্কর ভুল, আমার যন্ত্রণার কিছুমাত্র লাঘব করতে পারেনি এবং যখন শেষ পর্যন্ত আমাকে ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, তখন আমি এতটাই হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলাম যে, আমি লক্ষ করিনি আমার শিক্ষিকার স্নেহভরা স্পর্শ অথবা বন্ধুদের প্রিয়সম্ভাষণ, যারা এক সময় বলেছিল, আমি এক সাহসী ছোট্ট মেয়ে এবং তারা আমার জন্য গর্ববোধ করেছিল।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে রাতে এমন কেঁদেছিলাম যে, আমার মনে হয় তেমন কান্না খুব কম শিশুই কেঁদেছে। আমি এত শীত অনুভব করছিলাম যে আমার মনে হচ্ছিল আমি সকাল হওয়ার আগেই মরে যাব আর ঐ চিন্তাটা আমাকে স্বস্তি দিচ্ছিল না। আমার মনে হয়, বয়স বাড়ার পর যদি এই দুঃখ আমি পেতাম, তবে তা সারানোর অযোগ্য করে আমার কর্মশক্তিকে চুরমার করে দিত। কিন্তু বিস্মৃতির দেবদূত একসময় জড়ো করে নিয়ে গিয়েছিল সেই দুঃখ আর তিক্ততার অনেকটাই যা জড়িয়েছিল সেই দিনগুলোর সাথে।

মিস সুলিভান কোনোদিনই শোনেননি 'দ্য ফ্রস্ট ফেয়ারি'-এর নাম অথবা সেই বইটার নাম, যাতে এটা প্রকাশিত হয়েছিল। ডা. গ্রাহাম বেল-এর সহায়তায় তিনি ব্যাপারটা অনুসন্ধান করেছিলেন সতর্কতার সাথে এবং শেষ পর্যন্ত এটা প্রকাশিত হয়েছিল যে, মিসেস সোফিয়া সি. হপকিনস্ এর কাছে মিস ক্যানবির 'বার্ডি ও তার বন্ধুরা' বইটির একটি কপি ছিল ১৮৮৮ সালে। সে বছর ব্রিউস্টারে তাঁর সাথে আমরা গ্রীষ্মকাল কাটিয়েছিলাম। মিসেস হপকিনস্ খুঁজে বের করতে পারেননি তাঁর বইটা। কিন্তু তিনি আমাকে বলেছিলেন, যে সময়টা মিস সুলিভান ছুটিতে ছিলেন, তখন তিনি আমাকে খুশি করার জন্য পড়ে শোনাতেন নানা বই থেকে, যদিও তিনি মনে করতে পারেননি 'দ্য ফ্রস্ট ফেয়ারিজ' বইটা পড়ার বিষয়ে, তবুও তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে 'বার্ডি ও তার বন্ধুরা' বইটা ছিল তাঁর পড়ে শোনানো বইগুলোর মধ্যে একটা। তিনি বইটা অদৃশ্য হওয়ার ব্যাপারে এই রকম ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন যে, বাড়ি বিক্রি করার আগে তাঁর হাতে কম সময় ছিল এবং ঐ সময় বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল ছোটদের অনেক বইপত্র : যেমন পুরোনো স্কুলে পড়ানো হয় এমন বই, রূপকথা। 'বার্ডি ও তার বন্ধুরা' বইটাও সম্ভবত বিক্রি করা বইগুলোর মধ্যে ছিল।

গল্পগুলোর খুব সামান্য অর্থ বা তাৎপর্য– বলতে গেলে কোনো তাৎপর্যই ছিল না আমার কাছে; তবে যে শিশু নিজেকে আনন্দ দিতে প্রায় কিছুই করতে পারত না, সে শিশুর জন্য অপরিচিত শব্দগুলো বানান করাই নিজেকে আনন্দ দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল; যদিও আমি গল্প পড়ার সাথে কোনো ঘটনা যুক্ত থাকতে পারে বলে মনে করতে পারি না। তবু আমি শোনা শব্দগুলো মনে রাখতে খুব চেষ্টা করেছিলাম, যাতে আমার শিক্ষিকা ফিরে এসে সেগুলোর ব্যাখ্যা করতে পারেন। একটা ব্যাপার কিন্তু নিশ্চিত; যে যে ভাষা শুনেছিলাম তা অমোছনীয়ভাবে আমার স্মৃতিতে বহুদিন পর্যন্ত ছাপ রেখে গিয়েছিল। কেউ জানত না সে কথা, এমনকি আমি নিজেও না।

www.amarboi.org

যখন মিস সুলিভান ফিরে এসেছিলেন, আমি তাঁকে 'দ্য ফ্রস্ট ফেয়ারিজ' সম্বন্ধে কিছু বলিনি। সম্ভবত এই কারণে যে তিনি সাথে সাথেই পড়তে শুরু করেছিলেন 'লিট্‌ল্ লর্ড ফন্টলেরয়' যা আমার মন পূর্ণ করে দিয়েছিল অন্য সবকিছুকে বর্জন করেই। কিন্তু আসলে সত্যি ঘটনা হলো, মিস ক্যানবির গল্পটা আমাকে পড়ে শোনানো হয়েছিল একবার এবং দীর্ঘ সময়ের পর আমি ভুলে গিয়েছিলাম সেটা, এটা আমার স্মৃতিতে এসেছিল এত স্বাভাবিকভাবে যে আমি কখনো সন্দেহ করিনি ওটা ছিল অন্য কোনো মনের 'মানস পুত্র'।

দুঃসময়ে অনেক লিখিত বার্তা পেয়েছিলাম, যেগুলো ভালোবাসা আর সহানুভূতিতে ভরা ছিল। সব বন্ধু, যাদের আমি সব থেকে বেশি ভালোবাসতাম, একজন ছাড়া তারা আমারই পরমাত্মীয় হয়ে রয়ে গেছে।

মিস ক্যানবি স্বয়ং সহৃদয়তার সাথে লিখেছিলেন, 'একদিন তুমি নিজের কল্পনা থেকে মহৎ গল্প লিখবে, যা হবে অনেকের কাছে মানসিক স্বস্তি ও সাহায্য।' কিন্তু এই স্নেহময় ভবিষ্যদ্বাণী কখনই সত্য, পূর্ণ হয়নি। শুধু খেলার আনন্দ পাওয়ার জন্য আমি শব্দ নিয়ে খেলা করিনি আর কখনও। সত্যি বলতে কী, সেই থেকে আমি নিপীড়িত হতাম এই ভেবে যে যা আমি লিখি তা আমার নিজের নয়। অনেক কাল পর্যন্ত এভাবে চলেছে। যখন আমি আমার মাকেও কোনো চিঠি লিখতাম, আতঙ্কের অনুভূতি আমাকে গ্রাস করত এবং আমি লেখা বাক্যগুলো বানান করে বারবার পড়তাম নিশ্চিত হওয়ার জন্য যে আমি ওগুলো আগে কখনও কোনো বই-এ পড়িনি। মিস সুলিভান-এর নিরন্তর উৎসাহ না পেলে আমার মনে হয়, আমি লেখার চেষ্টা করাই ছেড়ে দিতাম একেবারে।

আমি এরপর 'ফ্রস্ট ফেয়ারিজ' পড়েছি, এবং সাথে পড়েছি সেই চিঠিগুলোও যে চিঠিগুলোতে আমি মিস ক্যানবির অন্য চিন্তা ভাবনা ব্যবহার করেছিলাম। আমি ঐ চিঠিগুলোর মধ্যে দেখতে পেয়েছি একটা চিঠি, যেটা ছিল ক্ষি অ্যানাগ্‌নসকে লেখা এবং যার তারিখ ছিল সেপ্টেম্বর ২৯, ১৮৯১। সে চিঠির শব্দগুলো এবং অনুভূতিগুলো ছিল একেবারে ঠিক ঐ বইগুলোর একটার মতো। ঐ সময়ই আমি লিখছিলাম 'দ্য ফ্রস্ট কিং' এবং এই চিঠিটাতে অন্যান্য অনেক চিঠির মতো অনেক বাগ্‌ধারা রয়েছে যেগুলো থেকে প্রমাণ হয় যে, আমার চিন্তা চেতনা আচ্ছন্ন হয়েছিল গল্পটার সাথে। আমি আমার শিক্ষিকাকে উপস্থাপন করেছিলাম এইভাবে যে, তিনি আমাকে শরৎকালের সোনালি পাতা সম্বন্ধে বলছেন, 'হ্যাঁ, ওরা এত সুন্দর, মনোমুগ্ধকর যে গ্রীষ্মের দ্রুত চলে যাওয়ার বেদনাতেও সান্ত্বনা হয়ে শোভা পায়'— এটা একটা ভাব যা মিস ক্যানবির গল্প থেকে সরাসরি নেওয়া।

যে লেখা মুগ্ধ করত আমাকে, তা আত্মস্থ করে আমার প্রথম দিককার লেখার প্রচেষ্টার মধ্যে আবার ব্যবহার করতাম বলে মনে হতো। একটা লেখায় আমি গ্রীস এবং ইতালির পুরোনো শহরগুলো সম্বন্ধে লিখেছিলাম, এজন্য আমি নানা উৎস থেকে সামান্য মাত্র পার্থক্য রেখে ধার করেছিলাম উজ্জ্বল, উচ্ছ্বসিত সব বর্ণনা।

www.amarboi.org

উৎসগুলোর কথা আমি ভুলে গেছি। আমি জানতাম মি. অ্যানাগ্‌নসে প্রাচীন কাল সম্বন্ধে গভীর অনুভূতি ও ভালোবাসার কথা এবং ইতালি ও গ্রিসের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর উৎসাহ এবং তাদের সৌন্দর্য সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহের কথা। তাই যে সব বই আমি পড়েছিলাম তা থেকে জড়ো করেছিলাম কবিতার টুকরো অথবা ইতিহাসের অংশ। আমি মনে করেছিলাম এগুলো তাঁকে আনন্দ দেবে। মি. অ্যানাগ্‌নস প্রাচীন শহর সম্বন্ধে আমার রচনা পড়ে বলেছিলেন, 'এই ধারণাগুলোর মূল ও অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য কাব্যধর্মী।' কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না কী করে তিনি ভাবতে পেরেছিলেন, এক অন্ধ ও বধির শিশু যার বয়স মাত্র এগারো, ওগুলোকে আবিষ্কার করতে পারে। এ সত্ত্বেও আমি ভাবতে পারি না, আমি নিজে ধারণাগুলোর সৃষ্টি করতে না পারলেও সেগুলোর কোনো আকর্ষণ কেন আমার কাছে থাকতে পারে না। লেখাগুলো কিন্তু আমাকে অনুভব করিয়েছিল যে, মনোরম এবং কাব্যিক ধারণাগুলো সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন এবং প্রাণবন্ত ভাষায় আমার উপলব্ধি আমি প্রকাশ করতে পারি।

ঐ সব প্রথম পর্বের রচনাগুলো ছিল এক ধরনের মানসিক চর্চার মতো। আমি শিখে চলেছিলাম, যেমন সব তরুণ এবং অনভিজ্ঞরা শেখে অনুকরণ এবং আত্মস্থ করার মধ্য দিয়ে। চিন্তা ও চেতনাকে শব্দের অবয়বে ধরে রেখে। যা কিছু আমি খুঁজে পেতাম বই-এ, যা কিছু আমাকে আনন্দিত ও পুলকিত করত, সে সব কিছুই আমি সঞ্চয় করে রাখতাম আমার স্মৃতিতে, স্মরণে, সচেতন প্রয়াসে অথবা অবচেতন গ্রহণে। ওগুলো পরিবর্তন আর উপযোগী করে নিতাম প্রয়োজনে। তরুণ লেখক স্টিভেনসন বলেছেন, প্রকৃতিগতভাবেই মানুষ চেষ্টা করে নিজের অনুসরণ করে, অনুকরণ করে, যা কিছু তার মনে হয় প্রশংসার যোগ্য এবং সে তার প্রশংসার বিষয়কে ব্যবহার করে বিস্ময়কর বহুমুখী সৃষ্টিতে। এই ধরনের বহুবছরের অনুশীলনের মধ্য দিয়েই, এমন কী মহান ব্যক্তিরাও শিখেছেন, কীভাবে সঠিক বিন্যাস করতে হয় অসংখ্য শব্দরাজি, যারা ভিড় করে আসতে থাকে মনে, তার প্রত্যেক নিরালা– নির্জন পথ বেয়ে।

আমি শঙ্কিত এই ভেবে যে, আমি এখনও শেষ করতে পারিনি এই প্রক্রিয়া, যার দ্বারা বিন্যস্ত করে নেওয়া যায় মনের মণিকোঠায় নির্জনে ভিড় করে থাকা শব্দরাজিকে। এটা নিশ্চিত যে, আমি সবসময় আমার নিজের চিন্তাকে যা পড়ি তা থেকে পৃথক করতে পারি না। কারণ যা আমি পড়ি, তাই হয়ে পড়ে একান্ত নিজস্ব বস্তু। ফলে, যা কিছু আমি শিখি, তাতে এমন কিছু সৃষ্টি করি যা দেখায় উন্মত্ত কল্পনাপ্রসূত কোনো জোড়াতালি দেওয়া কাপড়ের মতো, প্রথম সেলাই করতে শেখার সময় যা আমি বানাতাম। সেই জোড়াতালি দেওয়া জিনিস তৈরি হতো নানা টুকিটাকি জিনিসের টুকরো দিয়ে, যেমন– সুন্দর রেশমের কাপড় এবং ভেলভেটের টুকরো দিয়ে; তবে মোটা কাপড়ের টুকরো, যেগুলো স্পর্শসুখকর ছিল না, সেগুলোর সংখ্যাই ছিল বেশি। একইভাবে আমার লেখাগুলো তৈরি হয়েছিল আমার অপরিণত ধ্যান-ধারণা দিয়ে, যেগুলো খচিত থাকত আমার পড়া লেখকদের উজ্জ্বল চিন্তাধারা

www.amarboi.org

এবং অভিজ্ঞতালব্ধ মতামত দিয়ে। আমার মনে হয়– লেখার ক্ষেত্রে, যা সব থেকে কঠিন কাজ তা হলো– শিক্ষিত মনের ভাষা দিয়ে আমাদের অগোছালো চিন্তাগুলো, আর খণ্ডিত চিন্তা- চেতনাসমূহকে প্রকাশ করা। সেই বয়সে ধাঁধা সমাধান করার মতো বিভিন্ন চিন্তা সংহত করে তা লেখায় প্রকাশ করা যথেষ্ট কঠিন কাজ। আমাদের মনে রয়েছে একটা নকশা যা আমরা প্রকাশ করতে চাই শব্দে, কিন্তু শব্দগুলো খাপ খাবে না নকশার খোপগুলোতে, আর যদি তারা খাপ খায়ও, তাহলে তারা মিলবে না নকশাটার সাথে। কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালিয়ে যাই, কারণ আমরা জানি, এভাবেই অন্যেরা পেয়েছে সাফল্য এবং আমরা মেনে নিতে চাই না পরাজয়।

'মৌলিকত্ব অর্জনের কোনো পন্থা নেই, মৌলিকত্ব নিয়ে জন্মগ্রহণ করা ছাড়া', বলেছেন স্টিভেনসন এবং যদিও এমন হতে পারে যে আমি মৌলিকত্বের অধিকারী নই, আমি আশা করি কোনো একদিন পরচুলা পরার মতো অপরের ভাষায় সাজানো কৃত্রিম রচনা অতিক্রম করে পৌঁছে যাব মৌলিক কোনো রচনায়ও। তখনই, সম্ভবত, আমার নিজস্ব চিন্তা-চেতনা, অভিজ্ঞতা প্রকাশিত হয়ে পড়বে। ইতোমধ্যে, আমি বিশ্বাস করি এবং আশাও করি দৃঢ়ভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব, যাতে 'দ্য ফ্রস্ট কিং'-এর তিক্ত স্মৃতি ব্যাহত না করে আমার প্রচেষ্টাগুলোকে।

তাই এই দুঃখজনক অভিজ্ঞতা হয়ত আমার উপকারই করেছিল এবং আমাকে চিন্তা করিয়েছিল লেখার সাথে যুক্ত কিছু সমস্যা সম্পর্কে। আমার একটাই দুঃখ, এই ঘটনার ফলে আমি হারিয়েছিলাম আমার প্রিয়তম বন্ধুদের একজন, মি. অ্যানাগ্‌নসকে।

'দ্য স্টোরি অব মাই লাইফ' লেডিজ হোম জারনল-এ প্রকাশিত হওয়ার পরে, মি. অ্যানাগ্‌নস একটি বিবৃতি দিয়েছেন মি. ম্যাসিকে লেখা একটা চিঠিতে, যাতে তিনি লিখেছেন, 'ফ্রস্ট কিং'-এর ঘটনা চলার সময়, তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে আমি ছিলাম নির্দোষ। তিনি তাতে বলেছেন, তদন্তকারী বিচারসভা, যার সামনে আমাকে উপস্থিত করা হয়েছিল তা গঠিত হয়েছিল আটজন ব্যক্তিকে নিয়ে : এর মধ্যে চারজন সদস্য ছিলেন অন্ধ এবং চারজন সদস্য চক্ষুষ্মান ব্যক্তি। এর মধ্যে চারজন মনে করেছিলেন যে আমি জানতাম, মিস ক্যানবির গল্পটি পড়ে শোনানো হয়েছিল আমাকে, অন্যেরা এই মত গ্রহণ করেননি; মি. অ্যানাগ্‌নস বলছেন, তিনি তাঁর ভোটটি তাঁদের সাথেই দিয়েছিলেন যাঁরা ছিলেন আমার অনুকূলে।

কিন্তু ঘটনা যাই হোক না কেন, যে পক্ষেই তিনি তাঁর ভোট দিয়ে থাকুন না কেন, যখন আমি সেই ঘরটিতে প্রবেশ করেছিলাম যে ঘরে মি. অ্যানগ্‌নস প্রায়ই আমাকে ব্যস্ততা ভুলে তাঁর কোলে বসিয়েছিলেন, যেখানে যোগ দিয়েছিলেন আমার ছেলেমানুষিতে– সেখানেই কিছু মানুষকে দেখেছিলাম, যাঁরা মনে হয়েছিল সন্দেহ করছিলেন আমাকে। আমি অনুভব করছিলাম, ওখানে একটা কিছু ছিল যা মনে হচ্ছিল বিদ্বেষপূর্ণ এবং ভীতিপ্রদ আর তা ছিল সমস্ত পরিবেশ জুড়েই এবং পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ সেই ধারণাকেই সমর্থন করে। দু'বছর তিনি মনে হয় বিশ্বাস করেছিলেন

www.amarboi.org

যে, মিস সুলিভান এবং আমি ছিলাম নির্দোষ। তারপর তিনি নিশ্চিতভাবেই তার সহায়ক সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছিলেন, কিন্তু কেন, তা আমার জানা নেই। আমি কখনই জানতে পারিনি 'বিচার সভার' সেই সদস্যদের নামও যাঁরা আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করেননি। আমি এত উত্তেজিত এত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম যে, কোনো কিছুই লক্ষ করিনি আর। সত্যি বলতে কী, প্রায় মনেই করতে পারিনি আমি কী বলছিলাম অথবা কী বলা হচ্ছিল আমাকে।

আমি 'ফ্রস্ট কিং' এর সাথে যুক্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিলাম, কারণ এটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমার জীবন এবং শিক্ষার ব্যাপারে; যাতে কোনো ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ না থাকে, সে জন্য আমি খোলাখুলিভাবে ব্যাখ্যা করলাম সবকিছু। যাতে ছিল না আত্মপক্ষ সমর্থনের বাসনা অথবা কারোর ওপর দোষ চাপিয়ে দেওয়ার ভাবনা।

www.amarboi.org

পনের

'ফ্রস্ট কিং' ঘটনার ঠিক পরেই যে গ্রীষ্মকাল এবং শীতকাল এসেছিল, সেই সময় আমি আমার পরিবারের সাথে কাটিয়েছিলাম আলবামায়। সেই ঘরে ফেরার ঘটনা আমি আনন্দের সাথে স্মরণ করি। সবকিছুই মুকুলিত হয়েছিল, হয়েছিল প্রস্ফুটিতও। আমি ছিলাম সুখী। 'দ্য ফ্রস্ট কিং' চলে গিয়েছিল বিস্মৃতিতে।

এটা 'দ্য ফ্রস্ট কিং' লেখার এক বছর পর– যখন প্রান্তরে ছাড়িয়ে ছিল রক্তিম আর স্বর্ণবর্ণ শারদপত্র এবং মৃগনাভি সুবাসিত আঙুরে ঢাকা ছিল বাগানের শেষ প্রান্তে থাকা কুঞ্জবন, ক্রমশ স্বর্ণাভ পিঙ্গল বর্ণে রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল সূর্যালোকের স্পর্শে, এমনি একটা দিনে নিজের জীবনের একটা সংক্ষিপ্ত কাহিনী লিখতে শুরু করেছিলাম।

আমি তখনও অতিমাত্রায় সতর্ক ছিলাম আমার সব লেখা সম্বন্ধে। একটা চিন্তা যে, আমি যা লিখলাম তা হয়ত সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব চিন্তার ফসল নয়, এমন ভাবনা যন্ত্রণাবিদ্ধ করত আমাকে। আমার শিক্ষক ছাড়া এই যন্ত্রণার কথা কেউ জানত না। একটা অদ্ভুত সংবেদনশীলতা 'ফ্রস্ট কিং' সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করতে আমাকে বিরত করত; কথোপকথনের সময় প্রায়ই যখন কোনো চিন্তা বিদ্যুৎ ঝলকের মতো আমার মনে দেখা দিত, তখন আমি আলতো করে তাঁর হাতে লিখতাম, 'আমি নিশ্চিত নই যে চিন্তাটা আমার।' অন্য সময়গুলোতে, কোনো অনুচ্ছেদ লেখার মাঝে আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করতাম, 'মনে করা যাক, এটা খুঁজে পাওয়া গেল, এসবই লিখেছিলেন কেউ একজন অনেক কাল আগে!' একটা দানবের মতো ভয় দৃঢ়ভাবে আমার হাত চেপে ধরত যার ফলে আমি আর কিছু লিখতে পারতাম না সেদিন। এখনও আমি কখনও কখনও একই রকম অস্বাস্তি এবং উৎকণ্ঠা অনুভব করি। ওই সময় মিস সুলিভান আমাকে সান্ত্বনা দিতেন এবং সব রকম সাহায্য করতেন, কিন্তু যে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমাকে আসতে হয়েছিল তা আমার মনে রেখে গিয়েছিল দীর্ঘস্থায়ী ছাপ, যার তাৎপর্য আমি সবেমাত্র বুঝতে শুরু করেছি। আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার জন্য আমার শিক্ষিকা 'ইউথ'স কম্প্যানিয়ানে' আমার জীবনের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিখতে রাজি করিয়েছিলেন আমাকে। তখন আমার বয়স ছিল বারো। যখন আমি ফিরে তাকাই আমার এই ছোট্ট গল্প লেখার দিকে, তখন মনে হয়, নিশ্চিত ভাবেই অনাগত ভবিষ্যত সম্বন্ধে আমার দৃষ্টি ছিল ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মতো। তা না হলে আমি নিশ্চিতভাবেই বিফল হতাম।

আমি লিখেছিলাম ভয়ে ভয়ে, ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে কিন্তু দৃঢ় প্রত্যয়ে, আমার শিক্ষিকার প্রেরণায়। তিনি জানতেন, যদি আমি নিরন্তর চেষ্টা করে যাই তবে আমি আবার ফিরে পাব মানসিক স্থিতি ও দৃঢ়তা এবং আমার মৌলিক মানসিক ক্ষমতার

www.amarboi.org

ওপর ফিরে পাব পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। 'ফ্রস্ট কিং' উপাখ্যান লেখার সময় পর্যন্ত আমি একটি ছোট শিশুর অবচেতন বোধের জগতে বাস করছিলাম। তখন আমার চিন্তা হয়েছিল অন্তরমুখী আর আমি মানসচক্ষে দেখতাম অদৃশ্য বস্তুগুলোকে। আমি ক্রমশ বেরিয়ে এলাম অভিজ্ঞতার ঈষৎ অন্ধকার ছায়া থেকে এমন এক মন নিয়ে প্রতিনিয়ত যা প্রচেষ্টায় হয়ে উঠেছিল বেশি স্বচ্ছ এবং জীবন সম্পর্কে সত্য জ্ঞানে সমৃদ্ধ।

১৮৯৩ সালের প্রধান ঘটনাগুলো ছিল রাষ্ট্রপতি ক্লিভল্যান্ডের অভিষেকের সময় আমার ওয়াশিংটন যাওয়া এবং নায়েগ্রা যাত্রা এবং বিশ্বমেলা দেখতে যাওয়া। ওই অবস্থায় আমার পড়াশুনায় প্রতিনিয়ত বাধা সৃষ্টি হচ্ছিল এবং প্রায়ই অনেক সপ্তাহ ধরে পড়াশুনা বন্ধ থাকত। ফলে সে সময়কার পড়াশুনা সম্বন্ধে কোনো যথাযথ বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

আমরা নায়েগ্রা গিয়েছিলাম ১৮৯৩ সালের মার্চে। যখন আমি ওখানে দাঁড়িয়ে 'আমেরিকান ফলস্' আমেরিকান জলপ্রপাত দেখেছিলাম অর্থাৎ অনুভব করেছিলাম বাতাসের স্পন্দন আর পৃথিবীর কম্পন, সে আবেগের অভিজ্ঞতা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

এটা অনেকের কাছেই অদ্ভুত মনে হবে যে আমি নায়েগ্রার বিস্ময়করতা এবং সৌন্দর্যে মোহিত এবং গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলাম। তারা সবসময়ই আমাকে জিজ্ঞাসা করে থাকে, 'এই সৌন্দর্য অথবা ঐ সংগীতের অর্থ কী? তুমি তো বেলাভূমিতে ঢেউ-এর আছড়ে পড়া দেখতে পাও না, অথবা শুনতে পাও না তার গর্জন। ওগুলো তাহলে কী অর্থ বহন করে আনে?' স্পষ্টভাবে বলতে গেলে : তারা বোঝায় সব কিছু। আমি তাদের গভীরতা পরিমাপ করতে পারি না অথবা ব্যাখ্যা করতে পারি না তাদের অর্থ, যেমন আমি ভালোবাসার অথবা ধর্মের অথবা মহত্ত্বের গভীরতা পরিমাপ করতে অথবা ব্যাখ্যা করতে পারি না।

১৮৯৩-এর গ্রীষ্মে মিস সুলিভান এবং আমি বিশ্বমেলা দেখতে গিয়েছিলাম আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল-এর সাথে। আমি অনাবিল আনন্দের সাথে সেইসব দিনগুলোর কথা স্মরণ করি, যখন আমার সহস্র শিশুসুলভ কল্পনা পরিণত হয়েছিল মনোরম বাস্তবে। প্রতিদিন কল্পনায় ভর করে বিশ্ব পরিক্রমা করতাম এবং আমি দেখতাম অনেক বিস্ময়কর বস্তু যারা অবস্থান করত পৃথিবীর দূরতম প্রান্তে– দেখতাম বিস্ময়কর উদ্ভাবিত বস্তু, শিল্পের ধনভাণ্ডার এবং মানুষের দক্ষতা আর কর্মতরৎপরতা যা মনে হতো আমার আঙুলের সীমার মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করছে।

আমি 'মিডওয়ে প্লেইজেন্স্' পরিদর্শন করা পছন্দ করতাম। এটাকে মনে হয়েছিল 'আরব্য রজনী'। কারণ ওটা অভিনব বস্তু আর নানা আকর্ষণে পূর্ণ হয়ে থাকত। এখানে মূর্ত হয়ে উঠেছিল বই-এ পড়া আমার ভারতবর্ষ, তার দুর্লভ ও কৌতূহলোদ্দীপক বাজার নিয়ে যেখানে পাওয়া গেল শিবঠাকুরের মূর্তি আর হাতির শুঁড়ওয়ালা গণেশমূর্তি। সেখানে ছিল পিরামিডের দেশের একটা মডেল যাতে মূর্ত হয়ে উঠেছিল কায়রো শহরের 'লেগুন'গুলো। যেখানে আমরা ভ্রমণ করতাম

www.amarboi.org

জলপথে, প্রতি সন্ধ্যায় যখন শহর এবং ওখানকার ফোয়ারাগুলো আলোকিত উজ্জ্বল থাকত। এখানে আমি একটা জলদস্যুদের জাহাজেও চড়েছিলাম, যেটা রাখা ছিল ওখান থেকে সামান্য দূরে। এর আগে আমি বোস্টনে একটা যুদ্ধ জাহাজে চড়েছিলাম– যেটা দেখার পরই আমার জলদস্যুদের জাহাজে চড়ার ইচ্ছা হয়েছিল। ঐ জাহাজে ওঠার পর বুঝতে পেরেছিলাম নাবিকরা কীভাবে সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিল, কেমন করে তারা ঝড়ে উত্তাল অথবা শান্ত সমুদ্রকে একইভাবে গ্রহণ করত আর সাহস নিয়ে অতিক্রম করত সমুদ্র, তাড়া করত তাদের, যাদের রণধ্বনি ছিলঃ 'আমরাই সমুদ্রের সর্বেসর্বা!' ঐ সাহসী মানুষগুলির রণধ্বনি উচ্চারণরত মানুষের কাছে পৌঁছত। তারা যুদ্ধ করত বুদ্ধি আর শারীরিক শক্তি দিয়ে। তারা ছিল আত্মনির্ভরশীল, যত দিন পর্যন্ত না কতকগুলো মস্তিষ্কহীন নির্বোধ যন্ত্র তাদের অতি সাধারণ সব মানুষ বানিয়ে পিছনের সারিতে ঠেলে দিয়েছিল। তাই এটাই সর্বকালের সত্য, 'মানুষই সব থেকে আকর্ষণীয় মানুষের কাছে।'

এই জাহাজে থেকে একটু দূরেই ছিল 'সান্তা মারিয়া' জাহাজের একটা মডেল; সেটাও আমি পরীক্ষা করে দেখেছিলাম। জাহাজের ক্যাপটেন আমাকে দেখিয়েছিলেন কলম্বাসের কেবিন এবং সেই ডেস্কটা যার ওপর রাখা ছিল একটা বালি-ঘড়ি। এই ছোট্ট যন্ত্রটি আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছিল। কারণ ওটা আমাকে ভাবিয়েছিল কী অসম্ভব ক্লান্তি অনুভব করেছিলেন সন্ধানকারী এক বীর নাবিক যখন তিনি দেখেছিলেন বালির এক একটি কণার ঝরে পড়া, আর যখন বেপরোয়া কিছু মানুষ তাঁর জীবননাশের চক্রান্ত করছিল।

মি. হিগিনবথাম, যিনি ছিলেন বিশ্বমেলার সভাপতি, আমাকে প্রদর্শনীর জিনিসগুলো স্পর্শ করার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং যে তীব্র আসক্তি নিয়ে পিজারো পেরুর সঞ্চিত সম্পদ দখল করেছিল, আমিও তেমনি তীব্র আসক্তি নিয়ে মেলার বিশিষ্ট এবং গৌরবের বস্তুগুলোকে আঙুলে তুলে স্পর্শ করেছিলাম। পশ্চিমের এই শ্বেত-শুভ্র শহরটি আমার কাছে ছিল স্পর্শ-যোগ্য যাদুনলের মতো। সবকিছুই আমাকে মুগ্ধ করেছিল, বিশেষ করে ফরাসি দেশের ব্রোঞ্জ-এর মূর্তিগুলো। সেগুলো এতই জীবন্ত ছিল যে, আমার মনে হয়েছিল যে ওগুলো দেবদূতসদৃশ দিব্যদৃষ্টি যা শিল্পী আত্মস্থ করেছেন এবং তাদের পার্থিব অবয়বে মূর্ত করেছেন।

উত্তমাশা অন্তরীপের প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত বস্তু থেকে আমি কীভাবে খনি থেকে হীরা তোলা হয় তা জেনেছিলাম। যখনই সম্ভব হয়েছে আমি চালু অবস্থায় থাকা যন্ত্র স্পর্শ করেছিলাম, যাতে কীভাবে হীরা ওজন করা কিংবা কাটা এবং পালিশ করা হয় সে সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। যেখানে তখন হীরা ধোয়া হচ্ছিল, সেখানে আমি হীরা খুঁজে পেয়েছিলাম– ওরা বলেছিল সেটা ছিল সত্যিকারের হীরা যা যুক্তরাষ্ট্রে কদাচিৎ খুঁজে পাওয়া যায়।

ডা. বেল আমাদের সাথে সব জায়গাতেই গিয়েছিলেন এবং তাঁর নিজস্ব পরম আনন্দদায়ক ভঙ্গিতে সব থেকে আকর্ষণীয় জিনিস সম্পর্কে বর্ণনা করেছিলেন। যে

www.amarboi.org

বাড়িতে বিদ্যুৎ বিষয়ক জিনিস রাখা ছিল, সেখানে আমরা পরীক্ষা করেছিলাম টেলিফোন, অটোফোন, গ্রামোফোন এবং অন্যান্য আবিষ্কৃত দ্রব্যগুলো এবং তিনি আমাকে বুঝিয়েছিলেন কীভাবে তারের মধ্য দিয়ে খবরাখবর পাঠানো যায়, যার সাহায্যে স্থান-কালকে ছাড়িয়ে যায় এবং প্রমিথিউসের মতো আকাশ থেকে টেনে আনা যায় আগুনকে। তিনি আমাদের নৃতত্ত্ব বিভাগেও নিয়ে গিয়েছিলেন এবং ওখানে আমি মেক্সিকোর প্রাচীন স্মারকগুলোর প্রতি আগ্রহী ছিলাম, যেগুলো ছিল পাথরের তৈরি অমসৃণ হাতিয়ার এবং যেগুলো প্রায়ই কোনো যুগের ইতিহাসের একমাত্র নথি হিসাবে গণ্য করা হয়। প্রকৃতির নিরক্ষর সন্তানদের সরল স্মৃতিসৌধগুলো মনে হয় কালজয়ী হতে বাধ্য অথবা রাজাদের আর ঋষিদের স্মৃতি সৌধ ধ্বংস হয়, পরিবর্তিত হয় ধূলায়। আমি অবশ্য মিশরের মমিগুলো দেখলেও স্পর্শ করিনি। আসলে ওগুলো স্পর্শ করতে আমি অনিচ্ছুক ছিলাম। শোনা এবং বই পড়ার চেয়ে এই সব পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো থেকে আমি অনেক বেশি শিক্ষা লাভ করেছিলাম মানুষের অগ্রগতি সম্পর্কে ।

এই সমস্ত অভিজ্ঞতা আমার শব্দভাণ্ডারে বহু নতুন পরিভাষা এবং নতুন শব্দ যুক্ত করেছিল এবং যে তিন সপ্তাহ আমি মেলায় কাটিয়েছিলাম সেই সময়ের মধ্যেই আমি শিশুর রূপকথার জগৎ এবং খেলনার জগৎ থেকে একটা বিরাট লাফ দিয়ে পৌঁছে গিয়েছিলাম উপলব্ধির জগতে, যা ছিল বাস্তব এবং আন্তরিকতায় পূর্ণ কাজের জগৎ।

www.amarboi.org

ষোল

১৮৯৩ সালের অক্টোবরের আগে আমি নানা বিষয়ে নিজে নিজেই অধ্যয়ন করেছিলাম এবং তা করেছিলাম খানিকটা এলোমেলো ভাবেই। আমি গ্রিস, রোম এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস পড়েছিলাম। আমার কাছে উঁচু অক্ষরে ছাপা একটা ফরাসি ভাষার ব্যাকরণ ছিল এবং যেহেতু ইতোমধ্যেই আমি খানিকটা ফরাসি ভাষা জানতাম, তাই আমি নিজের বুদ্ধিতে নতুন নতুন শব্দ ব্যবহার করে কিছু ছোট ছোট অনুশীলনী রচনা করে খানিকটা মজা পেতাম, আর যতটা সম্ভব উপেক্ষা করতাম ব্যাকরণের নিয়মগুলোকে। এমনকি, আমি কারো সাহায্য ছাড়াই ফরাসি ভাষার উচ্চারণ আয়ত্ত করতে চেষ্টা করেছিলাম, যেহেতু সমস্ত ধ্বনির বর্ণনা দেওয়া ছিল বইতে। অবশ্য, এটা ছিল স্বল্প ক্ষমতা ব্যবহার করে বৃহৎ কোনো ফল পাওয়ার চেষ্টা মাত্র। তবে এই শেখার কাজটা বর্ষার দিনে সুযোগ করে দিত কিছু একটা করার এবং এইভাবে আমি ফরাসি ভাষায় অর্জন করেছিলাম যথেষ্ট জ্ঞান যার সাহায্যে আনন্দের সাথে পড়েছিলাম La Fontaine-এর 'Fables', 'Le Medecine Malgre Lui' এবং 'Athalie'-এর কিছু অনুচ্ছেদ।

বাকশক্তিকে উন্নত করার জন্য আমি প্রচুর সময় দিতাম। মিস সুলিভানের সামনে উচ্চস্বরে আমার প্রিয় কবিদের লেখা থেকে পড়তাম, যেগুলো আমি মুখস্থ করেছিলাম; তিনি আমার উচ্চারণ শুদ্ধ করে দিতেন এবং আমাকে সাহায্য করতেন বাক্‌বৈশিষ্ট্য এবং ধাতুরূপ শিখতে। এটা অবশ্য ১৮১৩ সালের অক্টোবরের আগে অভ্যাস করা হয়নি যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি বিশ্বমেলা দেখার দরুণ আমার মানসিক উত্তেজনা এবং অবসাদ কাটিয়ে ওঠার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৮১৩ সালের অক্টোবর মাসের পরে আমি উক্ত কাজগুলো শুরু করি।

মিস সুলিভান এবং আমি পেনসিলভানিয়ার উইলিয়াম ওয়েডের পরিবারের সাথে ছিলাম। তাঁদের একজন প্রতিবেশী মি. আয়রনস ছিলেন একজন ভালো ল্যাটিন পণ্ডিত। ঠিক হয়েছিল, যে আমি তাঁর তত্ত্বাবধানে ল্যাটিন শিখব। আমি তাঁকে মনে রেখেছি একজন বিরল মধুর স্বভাবের ব্যক্তি হিসাবে এবং একজন প্রচুর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবেও। তিনি আমাকে মূলত ল্যাটিন ব্যাকরণ পড়াতেন; কিন্তু তিনি প্রায়ই আমাকে গণিত শিক্ষায়ও সাহায্য করতেন, এ বিষয়টা একই সাথে আমার কাছে অসুবিধাজনক এবং নীরস মনে হতো। মি. আয়রনস আমার সাথে টেনিসনের 'ইন মেমোরিয়াম'ও পড়তেন। আমি এর আগেও অনেক বই পড়েছিলাম কিন্তু এখনকার মতো সমালোচনার দৃষ্টিকোণ থেকে পড়িনি কখনও। আমি এই প্রথম জেনেছিলাম একজন লেখক সম্বন্ধে, তাঁর রচনাকে চিনতে যেমন আমি হাত ধরার রকম থেকে কোনো বন্ধুকে চিনে নিতে পারি।

www.amarboi.org

প্রথম দিকে ল্যাটিন ব্যাকরণ অধ্যয়নের ব্যাপারে আমি কিছুটা অনিচ্ছুক ছিলাম। ব্যাপারটা আমার কাছে অযৌক্তিক এবং সময়ের অপচয় মনে হতো, যে শব্দই আমি পাই না কেন, সেটা বিশেষ্য কি না, সম্বন্ধ পদ কি না, সেটা একবচন কিনা অথবা তার লিঙ্গ কী, তা জানার চেষ্টা করা, যখন শব্দটার অর্থ ছিল যথেষ্ট সহজ-সরল। আমি ভেবেছিলাম তাহলে তো বিড়ালটার বিষয়ে কিছু জানতে গেলে– বিড়ালটার ধারা, মেরুদণ্ডী : বিভাগ, চতুষ্পদ : শ্রেণী, স্তন্যপায়ী : গোত্র, বিড়ালজাতীয় জীব, ব্যক্তি-পরিচিতি : ট্যাবি– এ সবই জানতে হবে আমাকে। কিন্তু যতই আমি বিষয়টার গভীরে প্রবেশ করতে থাকলাম, ততই আগ্রহী হয়ে ওঠলাম, এবং ভাষার সৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ করল। আমি প্রায়ই ল্যাটিন অনুচ্ছেদ থেকে সেই সব শব্দ চয়ন করে মজা পেতাম, যেগুলোর অর্থ আমি বুঝতাম এবং যেগুলোর অর্থ আমি বুঝতে চেষ্টা করতাম। আমি কখনও ঐভাবে অবসর বিনোদনের রাস্তা থেকে সরে আসিনি।

চঞ্চল ধাবমান চিত্রকল্পগুলো ও অনুভূতিগুলো, যা কোনো ভাষার মাধ্যমে উপস্থাপিত হয় এবং যার সাথে একজন ক্রমশ পরিচিত হতে থাকে– সেসব চিন্তা উড়ে চলে যেতে থাকে মনের আকাশ বেয়ে, যা গঠিত হয় এবং রঞ্জিত হয় খেয়ালি কল্পনার রঙে, তার চেয়ে সুন্দর হতে পারে না আর কিছুই। পড়ানোর সময় মিস সুলিভান সর্বক্ষণ বসে থাকতেন আমার পাশে আর মি. আয়রনস যা আমাকে বলতেন, তা বানান করে লিখে দিতেন আমার হাতে আর আমার জন্য খুঁজতেন নতুন নতুন শব্দ। আমি সবেমাত্র পড়তে শুরু করেছিলাম সিজারের 'গ্যালিক ওয়ার' আর সেই সময়েই আমি চলে গিয়েছিলাম আমাদের আলবামার বাড়িতে।

www.amarboi.org

সতের

১৮৯৪ সালের গ্রীষ্মকালে আমি চাওতাওকোয়াতে 'অ্যামেরিকান অ্যাসোসিয়েশন টু প্রোমোট দ্য টিচিং অব স্পিচ টু দ্য ডেফ'-এর সভায় যোগ দিয়েছিলাম। সেখানে স্থির হলো, আমি নিউইয়র্ক শহরে 'রাইট-হিউম্যানস স্কুল ফর দ্য ডেফ'-এ পড়তে যাব। আমি মিস সুলিভানের সাথে ওখানে গিয়েছিলাম ১৮৯৪ সালের অক্টোবরে। ঐ স্কুলটা বাছাই করা হয়েছিল যাতে আমি কণ্ঠস্বরচর্চার সর্বোচ্চ সুযোগ এবং 'ওষ্ঠ-পাঠ'-এর হাতে-কলমে শিক্ষার সর্বোচ্চ সুযোগ পেতে পারি। আমি দু'বছর ঐ স্কুলে থাকার সময় উপরে উল্লেখিত দুটি বিষয় চর্চা করার সাথে সাথে পাটিগণিত, প্রাকৃতিক ভূগোল, ফরাসি ও জার্মান ভাষা পড়াশোনা করেছিলাম।

আমার জার্মান ভাষার শিক্ষিকা মিস রিমি আঙুলের স্পর্শের মাধ্যমে পড়ার রীতি অর্থাৎ ব্রেইল বর্ণমালা ব্যবহার করতে জানতেন। আমি অল্প কিছু আয়ত্ত করার পর সুযোগ পেলেই জার্মান ভাষায় কথা বলতাম এবং অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই, তিনি যা বলতেন প্রায় তার সবই বুঝতে পারতাম। প্রথম বছর শেষ হওয়ার আগেই গভীর আনন্দের সাথে আমি 'Wilhelm Tell' বইটি পড়ে ফেলেছিলাম। আমার ধারণা, আমি অন্যসব বিষয়ের চেয়ে জার্মান ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে বেশি এগিয়ে ছিলাম। আমার ফরাসি ভাষাটা বেশি কঠিন বলে মনে হতো। ফরাসি পড়তাম ম্যাডাম অলিভিয়ের নামে এক ফরাসি মহিলার কাছে যিনি 'ব্রেইল বর্ণমালা' ব্যবহার করতে জানতেন না। তিনি তাই শিক্ষা দিতেন মুখে বলে। আমি সহজে তাঁর 'ঠোঁটের পাঠ' ভালোভাবে অনুসরণ করতে পারতাম না, তাই ফরাসি ভাষা শেখায় আমার অগ্রগতি ছিল জার্মান ভাষা থেকে অনেক ধীরে। অবশ্য আমি কোনো প্রকারে 'Le Medecin Malgre Lui' পড়ে ফেলেছিলাম আবার। বইটা ছিল খুবই মজার, কিন্তু বইটাকে 'Wilhelm Tell' এর মতো অতটা পছন্দ করতাম না।

আমার 'ওষ্ঠ-পঠন'-এর ব্যাপারে আমার শিক্ষকরা এবং আমি যতটা উন্নতি হবে বলে আশা করেছিলাম এবং অনুমান করেছিলাম, তা হয়নি। আমার জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল অন্য সকলের মতো কথা বলা এবং আমার শিক্ষকেরা বিশ্বাস করতেন এটা আমার পক্ষে পারা সম্ভব হবে, যদিও আমরা নিষ্ঠার সাথে কঠোর পরিশ্রম করেছিলাম, তবু আমরা আমাদের লক্ষে পৌঁছাতে পারিনি। আমার ধারণা আমরা খুব বেশি উচ্চাশা করেছিলাম, তাই আমাদের নৈরাশ্যও ছিল অবশ্যম্ভাবী। আমি তখনও পাটিগণিতকে মনে করতাম একটা চোরা গর্তের ফাঁদ। আমি 'অনুমানের' চরম সীমান্ত অঞ্চলে 'ঝুলে থাকতাম'; ফলে নিজের এবং অপরাপরদের চরম অসুবিধায় ফেলতাম যুক্তির বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ধরে চলতে না পারার ফলে। আর

www.amarboi.org

যখন আমি কিছু অনুমান করতাম না, তখন কিছু না ভেবেই ঝাঁপিয়ে পড়তাম কোনো সিদ্ধান্তে, এই ধরনের ভুল এবং আমার নির্বুদ্ধিতা একাকার হয়ে আমার যতটা প্রাপ্য অথবা পাওয়া উচিত তার চেয়েও বেশি কষ্টের কারণ হয়ে উঠত।

যদিও এই ধরনের হতাশা মাঝে মাঝে আমাকে খুবই বিষণ্ন করে তুলত, আমি অন্য সব বিষয়ের পড়াশোনা, বিশেষত প্রাকৃতিক ভূগোলের পড়া চালিয়ে যাচ্ছিলাম অফুরন্ত উৎসাহে। প্রকৃতির গোপন রহস্য জানতে পারা আমার কাছে ছিল আনন্দের। 'দ্য ওল্ড টেস্টামেন্টের' চিত্রের মতো স্পষ্ট বর্ণনা থেকে জানতে পেরেছিলাম– স্বর্গের চারকোণ থেকে কীভাবে বাতাস প্রবাহিত করা হয়, কীভাবেই বা পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে উঠে আসে, কীভাবেই বা পাথরের বুক চিরে নেমে আসে নদী, কেমনভাবেই বা সমূলে উৎপাটিত হয় পর্বত এবং কীভাবেই বা মানুষ হতে পারে তার থেকেও শক্তিধর এবং সব শক্তিকে পরাজিত করতে পারে। নিউইয়র্কের ঐ দুটো বছর ছিল সুখের এবং আমি তাদের দিকে ফিরে তাকাই অকৃত্রিম আনন্দের সাথে।

আমি বিশেষভাবে স্মরণ করি, আমরা যে প্রতিদিন সেন্ট্রাল পার্কে বেড়াতে যেতাম সেই ঘটনাকে। শহরের শুধু এই জায়গাটাই ছিল আমার মনমতো। এই পার্কে পাওয়া সামান্যতম আনন্দও কমে যায়নি আমার কাছে। যতবারই আমি পার্কে প্রবেশ করতাম, ততবারই আমি এর বর্ণনা শুনতে পছন্দ করতাম। কেননা এটা সবদিক থেকেই ছিল মনোরম এবং সেই মনোরম দৃশ্যসংখ্যা ছিল এতই বেশি যে, যে ন'মাস আমি নিউইর্য়কে কাটিয়েছিলাম পার্কটিকে প্রতিদিন নিত্য নতুনভাবে দেখতে পেতাম।

বসন্তকালে আমরা দর্শনীয় স্থানগুলোতে বেড়াতে যেতাম। আমরা হাডসন নদীতে নৌকায় ঘুরে বেড়াতাম এবং ঘুরে বেড়াতাম নদীর সবুজ তীরে, যে নদীর কথা গাইতে ভালোবাসতেন ব্রায়ান্ট। আমি ভালোবাসতাম অনাড়ম্বর, আদিম সৌন্দর্য যা প্রকাশিত হতো খুঁটি পুঁতে পুঁতে তৈরি করা বেড়াগুলোতে। যে সব জায়গায় আমি বেড়াতে গিয়েছিলাম, তার মধ্যে ছিল 'ওয়েস্ট পয়েন্ট', 'ট্যারি টাউন', যা ছিল ওয়াশিংটন আরভিং-এর বাসস্থান। যেখানে আমি গিয়েছিলাম 'স্লীপি হলো' এর মধ্যে দিয়ে হেঁটে।

'রাইট-হিউম্যানস স্কুলের' শিক্ষকেরা সব সময়ই পরিকল্পনা করতেন কীভাবে যারা শুনতে পায় এবং উপভোগ করে সেসব ছাত্রদের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেবেন– কীভাবেই বা তাঁরা ছোট শিশুদের যে কটি ঝোঁক, প্রবৃত্তি এবং নিষ্ক্রিয় স্মৃতি আছে সেগুলোকে যথাযথভাবে ব্যবহার করবেন; এবং কীভাবেই বা তাদের বের করে আনবেন যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতি থেকে যাতে গাথা আছে তাদের জীবন।

আমি নিউইয়র্ক ছাড়ার আগেই আমার জীবনের সব থেকে শোকাবহ ঘটনায় আমার উজ্জ্বল দিনগুলো অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল, যা বাবার মৃত্যু ছাড়া আমাকে সহ্য করতে হয়নি কখনও। বস্টনের মি. জন পি. স্পলডিং মারা গিয়েছিলেন ১৮৯৬

www.amarboi.org

সালে। যাঁরা তাঁকে বিশেষভাবে জানতেন এবং ভালোবাসতেন, কেবল তাঁরাই জানবেন তাঁর বন্ধুত্বের মূল্য কী অপরিসীম আমার কাছে। তিনি ছিলেন এমন একজন, যিনি নিজেকে সকলের অগোচরে রেখে অনন্য উপায়ে সকলকে সুখী করেছিলেন। তিনি মিস সুলিভান এবং আমার প্রতি ছিলেন পরম সদয়। যতদিন আমরা তাঁর প্রিয় উপস্থিতি অনুভব করেছি, আমরা জানতাম তিনি আমাদের কাজকর্মের ওপর নজর রাখছেন, যার ফলে অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতেও কখনও নিরুৎসাহিত হয়ে পড়িনি আমরা। তাঁর চলে যাওয়া আমাদের জীবনে সৃষ্টি করেছিল যে শূন্যতার, তা আর কখনও পূর্ণ হয়নি।

www.amarboi.org

আঠার

১৮৯৬ সালের অক্টোবর মাসে আমি কেম্‌ব্রিজ স্কুল ফর ইয়াং লেডিজ-এ ভর্তি হয়েছিলাম র‍্যাড্‌ক্লিফ্‌-এ ভর্তি হওয়ার জন্য।

যখন আমি ছিলাম একটি ছোট্ট মেয়ে, সেই সময় একবার বেড়াতে গিয়েছিলাম ওয়েলেসলিতে এবং এই বলে বন্ধুদের অবাক করে দিয়েছিলাম, 'কোনো এক সময় আমি কলেজে পড়তে যাবো– আর সেই কলেজটা হবে 'হার্ভার্ড!' আমাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কেন আমি ওয়েলেসলিতে পড়তে যাব না, আমি উত্তরে বলেছিলাম, কারণ শুধু মেয়েরাই পড়ে ওখানে। কলেজে পড়তে যাওয়ার চিন্তা, আমার মনে দৃঢ়ভাবে গেঁথে গিয়েছিল এবং হয়ে উঠেছিল একটা আকুল আকাঙ্ক্ষা। যারা কানে শুনতে পায় এবং দেখতেও পায় সত্যিকারের, সে সব মেয়েদের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে একটা ডিগ্রি লাভ করতে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এবং বিচক্ষণ বন্ধুদের প্রবল বিরোধিতা উপেক্ষা করে এটা আমাকে করতে হয়েছিল। যখন আমি নিউইয়র্ক ছাড়লাম, তখন আমার ঐ ধারণাটা পরিবর্তিত হলো একটা অটল সংকল্পে এবং এটা স্থির হয়েছিল যে আমি পড়তে যাব কেম্‌ব্রিজেই। এটাই ছিল হার্ভার্ডে পৌঁছনোর এবং প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার আমার শিশুসুলভ ঘোষণা।

কেম্‌ব্রিজ স্কুলে পরিকল্পনা করা হয়েছিল, মিস সুলিভানও আমার সাথে ক্লাসে উপস্থিত থাকবেন এবং ওখানে যা পড়ানো হবে তা আমাকে ব্যাখ্যা করবেন।

অবশ্য আমার প্রশিক্ষকদের স্বাভাবিক ছাত্রদের ছাড়া অন্য ছাত্রদের পড়ানোর কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না এবং তাঁদের সাথে আলোচনা করার একমাত্র উপায় ছিল তাঁদের ঠোঁটের নড়াচড়া দেখে তাঁদের কথা বুঝে নেওয়া। প্রথম বছর আমার পড়ার বিষয় ছিল– ইংরেজদের ইতিহাস, ইংরেজি সাহিত্য, জার্মান, ল্যাটিন, পাটিগণিত, ল্যাটিন রচনা, এবং সমসাময়িক কিছু লেখা। এর আগে পর্যন্ত কলেজের জন্য প্রস্তুত হওয়ার উপযোগী কোনো নির্দিষ্ট পাঠক্রম আমি অনুসরণ করিনি কখনও; কিন্তু মিস সুলিভান আমাকে ইংরেজি খুব ভালোভাবেই অনুশীলন করিয়েছিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই আমার শিক্ষকদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে কলেজ কর্তৃক নির্দিষ্ট করা পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করে পড়ানো ছাড়া ইংরাজি বিষয়ে আমার বিশেষ কোনো শিক্ষার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া, ফরাসি ভাষায় আমার বেশ ভালো জ্ঞান ছিল। এছাড়া আমি ল্যাটিন-এ ছ'মাসের তালিম নিয়েছিলাম; তবে জার্মানই ছিল সেই বিষয় যার সাথে আমার পরিচয় ছিল সব চেয়ে বেশি।

তা সত্ত্বেও, যেকোনো কারণেই হোক, এত সব সুবিধার মধ্যেও, আমার পড়াশোনার অগ্রগতির ব্যাপারে কিছু অসুবিধা ছিল। মিস সুলিভান পাঠ্যপুস্তকের সব

www.amarboi.org

দরকারি বিষয় আমার হাতে বানান করে লিখতে পারতেন না এবং যথাসময়ে পাঠ্য বইগুলো ব্রেইল বর্ণমালায় ছাপানোও ছিল কঠিন কাজ, যদিও লন্ডন এবং ফিলাডালফিয়ায় থাকা আমার বন্ধুরা কাজটা তাড়াতাড়ি করে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিছুদিনের জন্য অবশ্য আমার ল্যাটিন পাঠ্যবিষয় আমাকে ব্রেইল বর্ণমালায় অনুবাদ করে নিতে হয়েছিল, যাতে আমি অন্যদের সাথে ল্যাটিন পড়া আবৃত্তি করতে পারি। আমার প্রশিক্ষককরা অল্পদিনের মধ্যেই আমার ত্রুটিপূর্ণ ভাষার সাথে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন যার ফলে তাঁরা সাথে সাথেই আমার প্রশ্নের উত্তর দিতেন এবং আমার ভুলগুলো শুধরে দিতেন। আমি ক্লাসে নোট নিতে পারতাম না, পারতাম না অনুশীলনীগুলো লিখতেও। কিন্তু বাড়িতে টাইপরাইটারে আমার সব রচনা এবং অনুবাদগুলো লিখতাম।

প্রতিদিন মিস সুলিভান আমার সাথে শ্রেণিকক্ষে যেতেন এবং শিক্ষকরা যা বলতেন আমার হাতে অসীম ধৈর্য সহকারে তা বানান করে লিখতেন। পড়ার সময়গুলোতে তিনি আমার জন্য অভিধান থেকে নতুন নতুন শব্দ খুঁজে বার করতেন আর যে সব নোট এবং বই ব্রেইল হরফে পাওয়া যেত না সেগুলো বারবার পড়ে শোনাতেন। ওই কাজের একঘেয়েমি, ক্লান্তি বুঝতে পারা অসম্ভব। ফ্রাউ গ্রোটে, যিনি ছিলেন আমার জার্মান ভাষার শিক্ষক এবং মি. গিলম্যান যিনি ছিলেন আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ, ওই দুজন শুধু আমাকে পড়াবেন বলে ব্রেইল বর্ণমালা শিখেছিলেন। প্রিয় ফ্রাউ গ্রোটে ছাড়া আর কেউই সম্পূর্ণভাবে অনুভব করতে পারেননি তার বানান করার পদ্ধতি কত মন্থর এবং কত অপ্রতুল ও অকিঞ্চিৎকর ছিল। সে যাই হোক, মিস সুলিভানকে বিশ্রাম দিতে তিনি সহৃদয়তার সাথে খুবই পরিশ্রম করে তাঁর পড়া বিশেষ পাঠ হিসাবে সপ্তাহে দুবার করে বানান করে পড়তেন। যদিও সকলেই আমাদের প্রতি ছিলেন সদয় এবং আমাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। এর মধ্যেই এমন একজন ছিলেন, যিনি বিরক্তিকর পরিশ্রমকে পরিবর্তিত করতে পারতেন আনন্দে। সে বছর আমি শেষ করেছিলাম পাটিগণিতের অঙ্ক, পুনঃঅনুশীলন করেছিলাম ল্যাটিন ব্যাকরণ, পড়েছিলাম সিজারের 'গ্যালিক ওয়ার' বই-এর তিনটি অধ্যায়। জার্মান ভাষার বইগুলো আমি পড়েছিলাম আংশিকভাবে নিজের আঙুলের স্পর্শে, আর আংশিকভাবে মিস সুলিভানের সহায়তায়; এগুলোর মধ্যে ছিল শিলারের Lied von der Glocke এবং Taucher, ছিল হাইনের Harzreise, ফ্রেইটাগ-এর Aus dem Staat Friedrichs des Grossen, রিলের Fluch Der Schonheit, লেসিং-এর Minna von Branhelm আর গ্যেটের Aus meinem Leben. এইসব জার্মান ভাষার বইগুলো পড়ে আমি অপার আনন্দ পেয়েছিলাম, বিশেষত শিলারের অপূর্ব গীতিকবিতাগুলো পড়ে। তাছাড়া, ফ্রেডরিক দ্য গ্রেইটের মহৎ কীর্তি-কাহিনী এবং গ্যেটের জীবনকাহিনী পড়েও পেয়েছিলাম গভীর আনন্দ। ডাই হার্জরেইশ বইটা পড়া শেষ হওয়ার পর বেশ দুঃখ অনুভব করেছিলাম কেননা বইটা পূর্ণ ছিল, বুদ্ধিদীপ্ত সরস মন্তব্যে, ছিল আঙুরলতায় ছাওয়া

www.amarboi.org

মোহময় পাহাড়ের রমণীয় বর্ণনা, যেখানে নদীরা বয়ে চলে গান গেয়ে গেয়ে আর সূর্যলোকে উজ্জ্বল বর্ণের তরঙ্গে পরিশোভিত হয়ে। আদিম স্বাভাবিক অবস্থায় থাকা বনাঞ্চলসমূহ, যারা পবিত্র আর অকৃত্রিম ঐতিহ্যের অনুসারী আর কিংবদন্তীর ধারক, রয়েছে তাদের কথাও। রয়েছে হারিয়ে যাওয়া কল্পনার যুগের ধূসর বোনেদের অনুজ্জ্বল কাহিনী, রয়েছে এইরকম সব কিছুরই বর্ণনা, যা বর্ণনা করতে পারেন তারাই, যাদের কাছে প্রকৃতি একটা অনুভূতি, প্রেম আর আকাঙ্ক্ষা।

মি. গিলম্যান আমাকে বছরের একটা ভাগে ইংরেজি সাহিত্য পড়িয়েছিলেন। আমরা চর্চা করেছিলাম, As You Like It, বার্ক-এর Speech on Conciliation with America এবং মেকলের Life of Samuel Johnson. মি. গিলম্যান-এর সাহিত্য এবং ইতিহাস সম্পর্কে উদার দৃষ্টিভঙ্গি এবং বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাখ্যাসমূহ আমার পড়াশোনার কাজকে সহজ এবং আনন্দময় করে তুলেছিল যা আমি যান্ত্রিকভাবে শ্রেণীকক্ষে দেওয়া নোট এবং সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা পড়ে অনুভব করতে পারতাম না।

রাজনৈতিক মতবাদের ওপর আমি যত বই পড়েছিলাম, তার মধ্যে বার্কের বই ছিল অন্য সব বই-এর চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষামূলক। আমার মন আলোড়িত হয়েছিল সেই আলোড়নকারি সময়ে, আর যে সব ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি দেশের মানুষের জীবন কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছিল, মনে হচ্ছিল তারা যেন আমার সামনেই ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমি আশ্চর্য থেকে আরো আশ্চর্য হচ্ছিলাম যখন বার্কের বাগ্মীতা উত্তাল তরঙ্গের মতো আছড়ে পড়ছিল। আমি এটা ভেবে আশ্চর্য হই কীভাবে রাজা জর্জ এবং তাঁর মন্ত্রিরা কর্ণপাত না করে থেকেছিলেন বার্কের সতর্ক ভবিষ্যদ্বাণী এবং আমাদের বিজয় এবং তাঁদের অবমাননাকর পরিস্থিতি সম্পর্কে। তারপর পাঠ করেছিলাম বিষণ্ন সেই পরিস্থিতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায়, যেখানে ঐ ব্যক্তিত্ব তাঁর নিজের দল এবং জনগণের প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি অবাক হয়ে ভাবতাম এটা কী রকম আশ্চর্যজনক কাজ ছিল যে, সত্যের এবং জ্ঞানের ঐ রকম মহার্ঘ বীজগুলো গিয়ে পড়েছিল পশুখাদ্যের মতো নিকৃষ্ট কিছু অজ্ঞতা এবং দুর্নীতির মধ্যে।

কিছুটা ভিন্ন দিক থেকে মেকলের লাইফ অব স্যামুয়েল জনসন ছিল কৌতূহল-উদ্দীপক। আমার মন চলে যেত সেই নিঃসঙ্গ মানুষটির কাছে, যিনি গ্রাব স্ট্রিট-এ অত্যন্ত বেদনাদায়ক পরিস্থিতে আয় করতেন, কিন্তু তবুও সেই পরিশ্রম এবং নিষ্ঠুর শারীরিক এবং মানসিক যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি দরিদ্র এবং ঘৃণার চোখে দেখা মানুষদের প্রতি তাঁর সহানুভূতির হাত প্রসারিত করতেন এবং করতেন সদয় ব্যবহার। আমি তাঁর সকল সাফল্যেই আনন্দ উপভোগ করতাম, আমি তাঁর ত্রুটিগুলোর দিকে চোখ বুজে থাকতাম এবং এই ভেবে অবাক হতাম না যে ঐ ত্রুটিগুলো তাঁর ছিল। বরং এই ভেবে অবাক হতাম যে, ওগুলো তাঁর অন্তরাত্মাকে ছোট অথবা চূর্ণ করতে পারেনি। কিন্তু মেকলের মেধার উজ্জ্বল এবং অতি সাধারণ জিনিসকেও সজীব এবং প্রাঞ্জল করে তোলার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাঁর কখনও

www.amarboi.org

কখনও মাত্রাধিক আস্থা ক্লান্ত করত আমাকে। প্রায়ই প্রভাব বিস্তারের জন্য তাঁর সত্যকে বিসর্জন দেওয়ায় সংশয় জাগাত আমার মনে, যেটা অবশ্যই একবারে আলাদা ছিল সেই শ্রদ্ধার মনোভাবের থেকে যখন আমি গ্রেট ব্রিটেনের ডেমোসথেনেসের বক্তৃতা শুনতাম।

কেম্‌ব্রিজ স্কুলে জীবনে প্রথমবার আমি দেখতে এবং শুনতে পায় এমন আমার সমবয়সী মেয়েদের সাহচর্য উপভোগ করেছিলাম। অন্য অনেকের সাথে আমি একটা মনোরম বাড়িতে থাকতাম যে বাড়িতে এক সময় মি. হাওয়েলস্ বাস করতেন এবং এখানে আমরা সবাই নিজের বাড়িতে থাকার মতো সুযোগসুবিধা পেতাম। যারা দেখতে পায় এবং শুনতে পায় তাদের অনেক খেলায় যোগ দিতাম, এমনকি আমি তাদের সাথে কানামাছিও খেলতাম আর তুষারের ওপর আমোদ-প্রমোদ করতাম। আমি তাদের সাথে দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করতাম; আমরা আমাদের পড়াশোনা সম্পর্কে আলোচনা করতাম এবং যে বিষয়গুলো আমাদের ভালো লাগত সেগুলো উচ্চস্বরে পড়তাম। মেয়েদের কয়েকজন আমার সাথে বানান করে করে কথা বলতে শিখেছিল, তার ফলে তাদের কথাবার্তা মিস সুলিভানকে পুনরাবৃত্তি করতে হতো না।

ক্রিসমাসের ছুটির দিনগুলো আমার মা এবং ছোট বোন কাটিয়েছিল আমার সাথে এবং মি. গিলম্যান অনুগ্রহ করে তাঁর বিদ্যালয়ে মিলড্রেডকে পড়তে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ফলে মিলড্রেড আমার কাছে কেম্‌ব্রিজেই থেকে গিয়েছিল এবং পরবর্তী ছমাস আমরা বলতে গেলে একে অপরের থেকে আলাদা থাকিইনি। যে সময়গুলো আমরা একে অপরকে পড়াশোনায় সাহায্য করে এবং আনন্দ ভাগাভাগি করে কাটিয়েছিলাম, সেকথা মনে করলে আমার মন আনন্দে ভরে ওঠে।

১৮৯৭ সালের ২৯ জুন থেকে ৩ জুলাই পর্যন্ত আমি র‍্যাড্‌ক্লিফ্ কলেজে ভর্তি হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ের পরীক্ষা দিয়েছিলাম। সেগুলো হলো প্রাথমিক এবং উচ্চস্তরের জার্মান, ফরাসি, ল্যাটিন, ইংরেজি এবং রোমান ইতিহাস যা যোগ করলে দাঁড়ায় ন'ঘন্টার মতো। আমি সব কিছুতেই পাশ করেছিলাম এবং তার মধ্যে ইংরেজি ও জার্মান বিষয়ে 'অনার্স' পেয়েছিলাম।

যে পদ্ধতিতে আমি পরীক্ষা দিয়েছিলাম তার ব্যাখ্যা এখানে দিলে সম্ভবত অবান্তর হবে না। যে কোনো ছাত্রকে ষোল ঘন্টার পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে হতো— তার মধ্যে বারো ঘন্টার পরীক্ষাটাকে বলা হতো প্রাথমিক এবং চার ঘন্টার পরীক্ষাকে বলা হতো উচ্চস্তরীয়। কোনো ছাত্র এক নাগাড়ে পাঁচ ঘন্টা পরীক্ষা দিলে তবেই তার পরীক্ষাকে হিসেবের মধ্যে ধরা হতো। হার্ভার্ডে পরীক্ষাপত্র দেওয়া হতো বেলা ৯টায় এবং সেগুলো র‍্যাড্‌ক্লিফে আনা হতো বিশেষ বাহক দ্বারা। প্রত্যেক প্রার্থীকেই পরিচিত হতে হতো নিজের নামে নয়, সংখ্যার দ্বারা। আমি ছিলাম ২৩৩ নম্বর, যেহেতু আমাকে টাইপরাইটার ব্যবহার করতে হয়েছিল, সে জন্য আমার পরিচয় গোপন রাখা সম্ভব ছিল না।

www.amarboi.org

আমার ক্ষেত্রে এটা ভাবা হয়েছিল যে, আমি একাই একটা ঘরে পরীক্ষা দেব, কেননা টাইপরাইটারের আওয়াজ হয়তো অন্য মেয়েদের অসুবিধার সৃষ্টি করবে। মি. গিলম্যান সব প্রশ্ন আমাকে পড়ে শুনিয়েছিলেন ব্রেইল বর্ণমালার মাধ্যমে। যাতে কোনো বাধা না পড়ে তা নিশ্চিত করার জন্য একজনকে প্রহরী হিসাবে রাখা হয়েছিল।

আমার প্রথম দিনের পরীক্ষার বিষয় ছিল জার্মান। মি. গিলম্যান আমার কাছে বসে প্রথমে প্রশ্নপত্রটি পড়েছিলেন, তারপর পড়েছিলেন বাক্য ধরে ধরে। ঐ সময় আমি শব্দগুলো উচ্চস্বরে পুনর্বার বলতাম, এটা নিশ্চিত করতে যে, আমি প্রশ্নপত্রটা ঠিকভাবে বুঝতে পেরেছি। প্রশ্নপত্রগুলো কঠিন ছিল এবং আমি অত্যন্ত চিন্তিত হয়েছিলাম লেখার সময়। যা হোক, আমি আমার উত্তর টাইপরাইটারে লিখেছিলাম। আমি যা লিখেছিলাম, মি. গিলম্যান তা বানান করে করে পড়ে শুনিয়েছিলেন এবং আমি যে রকম পরিবর্তন করা প্রয়োজন বলে মনে করেছিলাম, তা করেছিলাম এবং উনি সেগুলো টাইপরাইটারে বসিয়েছিলেন। আমি এখানে বলতে চাই যে, এভাবে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ আর কখনও কোনো পরীক্ষায় পাইনি। র‍্যাড্‌ক্লিফে লেখার পর কেউ আমাকে পরীক্ষার উত্তর পড়ে শোনাত না। তাই, আমার কোনো ভুল শুদ্ধ করারও সুযোগ থাকত না, যদি না পরীক্ষা নির্দিষ্ট সময়ের আগে শেষ করতে পারতাম। সে ক্ষেত্রে পরীক্ষার সময় শেষ হওয়ার আগে যে অল্প কয়েক মিনিট সময় অনুমোদিত ছিল, তার মধ্যেই যতটুকু সম্ভব সংশোধনগুলো উত্তরপত্রের শেষে নথিবদ্ধ করতাম। আমি প্রাথমিক পর্বের পরীক্ষায় চূড়ান্ত পর্বের পরীক্ষাগুলোর চেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছিলাম। এর দুটি কারণ ছিল। চূড়ান্ত পরীক্ষার সময় আমার উত্তরপত্র লেখা শেষ হওয়ার পর তা আমাকে কেউ আর পড়ে শোনায়নি। তাছাড়া, প্রাথমিক পর্বের পরীক্ষায় আমি যে সব বিষয় নির্বাচন করেছিলাম, সে বিষয়গুলো সম্বন্ধে কেম্‌ব্রিজে আসার আগেই আমার বেশ খানিকটা পরিচিতি ছিল। কেননা, বছরের প্রথমেই আমি পাশ করেছিলাম ইংরেজি, ইতিহাস, ফ্রেঞ্চ এবং জার্মান ভাষায়। আর মি. গিলম্যান আগের কোনো বছরের হার্ভার্ডের প্রশ্নপত্র থেকে পরীক্ষাগুলোর প্রশ্ন দিয়েছিলেন।

মি. গিলম্যান আমার লেখা উত্তরপত্রগুলো পরীক্ষকদের কাছে পাঠানোর সময় এই মর্মে প্রশংসাপত্র লিখে দিয়েছিলেন যে প্রার্থী নং ২৩৩ নিজেই উত্তরপত্রগুলো লিখেছে।

প্রাথমিক স্তরের অন্য সব পরীক্ষাগুলোও এই ভাবেই নেওয়া হয়েছিল। পরের কোনো পরীক্ষাই প্রথম পরীক্ষার মতো অত কঠিন ছিল না। আমি সেইদিনের কথা মনে করতে পারি যেদিন আমাদের ল্যাটিন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দেওয়া হয়েছিল, সেদিন মি. সিলিং এসে আমাকে জানিয়েছিলেন যে, জার্মান ভাষায় আমি ভালোভাবে পাশ করেছি। এই খবরটা আমাকে দারুণভাবে উৎসাহিত করেছিল। এরপর আমি দ্রুত গতিতে কঠিন পরীক্ষাগুলো কিছুটা হাল্কা মনে এবং দৃঢ়তার সাথে লিখে শেষ করেছিলাম।

www.amarboi.org

উনিশ

গিলম্যান স্কুলে দ্বিতীয় বছর আরম্ভ করার সময় আমার মন ছিল আশায় পূর্ণ এবং দৃঢ় সংকল্প ছিল সাফল্য লাভের ব্যাপারে। কিন্তু প্রথম কয়েক সপ্তাহ ধরে আমাকে অপ্রত্যাশিত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মি. গিলম্যান এ ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন যে ঐ বছর আমি প্রধানত অধ্যায়ন করব গণিত নিয়ে। আমার পাঠ্য বিষয় ছিল পদার্থবিদ্যা, বীজগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষা। দুর্ভাগ্যবশত আমার প্রয়োজনীয় বইগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই ঠিক সময়ে ব্রেইল হরফে ছাপা হয়নি। তাছাড়া অন্য কিছু বিষয় পড়ার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কিছু যন্ত্রপাতিরও অভাব ছিল আমার। যে ক্লাসগুলোতে আমি পড়তাম সেগুলো ছিল খুবই বড় অর্থাৎ ঐসব ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা ছিল খুব বেশি এবং শিক্ষকদের পক্ষেও সেই অবস্থায় আমাকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া ছিল অসম্ভব। বাধ্য হয়েই মিস সুলিভান সমস্ত বিষয়ের বই আমাকে পড়ে শোনাতেন এবং প্রশিক্ষকদের হয়ে পাঠ ব্যাখ্যা করতেন। এগারো বছরে সেই প্রথম মনে হয়েছিল তাঁর স্নেহের হাতও ঐ কঠিন কাজ করেছিল।

ক্লাসে আমায় বীজগণিত এবং জ্যামিতি লিখে নিতে হতো এবং পদার্থবিদ্যার সমস্যাগুলো সমাধান করতে হতো, কিন্তু যত দিন পর্যন্ত না আমরা 'ব্রেইল রাইটার' কিনতে পেরেছিলাম, ততদিন পর্যন্ত ধাপে ধাপে বীজগণিত লেখা বা আমার কাজের পদ্ধতিগুলো লিখে রাখা সম্ভব ছিল না। ক্লাসে ব্ল্যাকবোর্ডে আঁকা জ্যামিতির চিত্রগুলো দেখা সম্ভব ছিল না এবং ঐগুলো সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা নেবার একমাত্র উপায় ছিল সেই চিত্রগুলোকে কুশনের ওপর এমনভাবে তৈরি করা যা সোজা এবং বাঁকা তার দিয়ে তৈরি এবং তাদের প্রান্তভাগ সূচিমুখো। মি. কিথ্ তাঁর প্রতিবেদনে বলেন, জ্যামিতির চিত্রগুলোর গঠন, সেই সম্পর্কে অনুমান এবং সিদ্ধান্ত, তাদের অঙ্কন এবং প্রমাণের পদ্ধতি, সবই আমাকে স্মৃতিতে ধরে রাখতে হতো। এক কথায় বলতে গেলে প্রত্যেক দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু বাধা ছিল। কখনও কখনও আমি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতাম এবং এমন হতাশাজনক আচরণ করতাম যে সে কথা মনে করতে লজ্জা হয়। বিশেষ করে যখন ভাবি যে, আমার সমস্যাগুলোর লক্ষণ বা কারণগুলো পরবর্তী কালে ব্যবহার করা হয়েছিল মিস সুলিভানের বিরুদ্ধে, যিনি ওখানে থাকা আমার সব সহৃদয় বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র ব্যক্তি যিনি বাঁকা জিনিসকে করতে পারতেন সোজা আর অমসৃণকে মসৃণ।

যাই হোক, অল্প অল্প করে আমার অসুবিধাগুলো দূর হতে থাকল। ব্রেইল হরফে ছাপা বইগুলো এবং অন্যসব যন্ত্রপাতি এসে গেল এবং আমি আমার কাজের মধ্যে

www.amarboi.org

ঝাঁপিয়ে পড়লাম নতুন আত্মবিশ্বাস নিয়ে। বীজগণিত এবং জ্যামিতি ছিল এমন দুটি বিষয়, যা আয়ত্ত করার আমার সমস্ত প্রচেষ্টাকে বিফল করে দিচ্ছিল। আমি আগে যেমন বলেছি যে, অঙ্ক শেখার ব্যাপারে আমার কোনো ঝোঁক ছিল না। তাছাড়া অঙ্ক আমি যেমন পরিপূর্ণভাবে বুঝতে চাইতাম, আমাকে তা সেই রকমভাবে ব্যাখ্যা করা বা বোঝানো হতো না। জ্যামিতির চিত্রগুলো আমার কাছে বিশেষভাবেই বিরক্তিকর ছিল, কারণ কুশনের ওপর থাকলেও তাদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে, তা আমি অনুধাবন করতে পারতাম না। মি. কিথ শিক্ষা দেওয়ার পূর্ব-পর্যন্ত আমার কোনো পরিষ্কার ধারণা ছিল না অঙ্ক সম্বন্ধে।

আমি যখন এই অবস্থাগুলো কাটিয়ে উঠতে আরম্ভ করেছিলাম সেই সময় এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল যা বদলে দিয়েছিল সবকিছু।

বইগুলো এসে পৌছনোর ঠিক আগেই মি. গিলম্যান, মিস সুলিভানের কাছে আপত্তি জানাতে আরম্ভ করেছিলেন এই ভিত্তিতে যে আমি খুব বেশি পরিশ্রম করছিলাম এবং আমার আন্তরিক এবং প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও আমার আবৃত্তির সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছিলেন। শুরুতে আমরা এ বিষয়ে একমত হয়েছিলাম যে, যদি প্রয়োজন হয় তবে কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য পাঁচ বছর স্কুলে পড়ব। কিন্তু এক বছর পর পরীক্ষায় আমার সফলতা মিস সুলিভান, মিস হারবো যিনি ছিলেন মি. গিলম্যানের স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী এবং আরো একজনকে, বুঝিয়েছিলেন যে আমি খুব বেশি চেষ্টা না করে আর দুবছরেই আমার প্রস্তুতি শেষ করতে পারব। মি. গিলম্যান প্রথমে এই প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলেন, কিন্তু যখন আমার পড়ার চাপ কিছুটা বিভ্রান্তিকর হয়ে উঠল, তখন তিনি এই ব্যাপারে জোর দিতে লাগলেন যে আমার অত্যধিক পরিশ্রম হচ্ছে এবং আমার উচিত তাঁর স্কুলে আরো তিন বছর থাকা। আমি এই পরিকল্পনা পছন্দ করলাম না, কারণ আমার ইচ্ছা ছিল আমার শ্রেণীর অন্যদের সাথে এক সাথে কলেজে প্রবেশ করা।

১৭ নভেম্বর আমার শরীর ভালো ছিল না বলে স্কুলে গেলাম না। যদিও মিস সুলিভান জানতেন আমার অসুস্থতা গুরুতর ছিল না, তবু মি. গিলম্যান আমার শরীর ভালো নেই শুনে ঘোষণা করলেন যে আমি ক্রমশ পাঠক্রমের চাপে ভেঙে পড়ছি এবং তিনি আমার পাঠক্রমে এমন পরিবর্তন করলেন যে আমার শ্রেণীর অন্যদের সাথে চূড়ান্ত পরীক্ষায় বসা সম্ভব হবে না আমার। শেষ পর্যন্ত মি. গিলম্যান এবং মিস সুলিভানের মধ্যে এ ব্যাপারে মতপার্থক্য হওয়ার ফলে মা আমার বোন মিলড্রেড এবং আমাকে কেম্‌ব্রিজ স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনলেন।

কিছুদিন পর একটা ব্যবস্থা করা হলো যে আমি আমার পড়া চালিয়ে যাব কেম্‌ব্রিজের মি. মার্টন এস. কিথ্ নামে একজন গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে। মিস সুলিভান এবং আমি বাকি শীতকালটা কাটিয়েছিলাম আমাদের বন্ধুদের সাথে রেনথামে, যে জায়গাটা ছিল বস্টন থেকে পঁচিশ মাইল দূরে।

www.amarboi.org

১৮৯৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত মি. কিথ্ রেনথামে পড়াতেন বীজগণিত, জ্যামিতি, গ্রিক এবং ল্যাটিন। মিস সুলিভান তাঁর পড়া এবং নির্দেশগুলো ব্যাখ্যা করে শোনাতেন।

১৮৯৮ সালের অক্টোবর মাসে আমরা বস্টনে ফিরে এলাম। আট মাস ধরে মি. কিথ্ আমাকে সপ্তাহে পাঁচদিন পড়াতেন– এবং প্রত্যেকটা বিষয়ে প্রায় এক ঘন্টা করে। তিনি প্রতিবারই আমাকে ব্যাখ্যা করে দিতেন সেই সব বিষয় যা আমি আগের দিনের পড়ানোর পর বুঝতে পারতাম না। নতুন কাজ অনুশীলন করার জন্য দিতেন এবং গ্রিক ভাষার যে অনুশীলনীগুলো আমি সারা সপ্তাহ ধরে টাইপরাইটারে লিখতাম সেগুলোকে সম্পূর্ণ সংশোধন করতে বাড়ি নিয়ে যেতেন এবং আমাকে ফেরত দিতেন।

এইভাবে আমার কলেজে যাওয়ার প্রস্তুতি চলতে থাকল বিনা বাধায়। আমি অনুভব করলাম ক্লাসে শিক্ষা নেওয়ার চেয়ে একা একা শিক্ষা নেওয়া আমার কাছে অনেক সহজ এবং আনন্দদায়ক। এখানে কোনো তাড়া ছিল না, আর ছিল না বিভ্রান্তিও। যা আমি বুঝতে পারতাম না সেই বিষয়গুলো আমার কাছে ব্যাখ্যা করার প্রচুর সময় ছিল আমার শিক্ষিকার। এর ফলে আমি দ্রুত সব কিছু আয়ত্ত করতে আরম্ভ করলাম এবং পড়াশোনার কাজটা স্কুলে থাকার সময়ের চেয়ে অনেক ভালোভাবে করতে থাকলাম। আমি তখনও পর্যন্ত গণিতের সমস্যা সমাধান করা অন্য যে কোনো বিষয়ের থেকে বেশি কঠিন মনে করতাম। কী আনন্দই না হতো, যদি বীজগণিত এবং জ্যামিতি ভাষা এবং সাহিত্যের মতো হতো। মি. কিথ্ অঙ্ককেই আকর্ষণীয় করেছিলেন; তিন অঙ্কের সমস্যাগুলোকে কাটছাঁট করে যথেষ্ট ছোট করে আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি আমার মনকে করে রেখেছিলেন সদাজাগ্রত এবং উৎসুক; সেটাকে শিক্ষিত করেছিলেন প্রাঞ্জলভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করতে এবং শান্ত ও যুক্তিসম্মতভাবে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে, উন্মত্তের মতো শূন্যে লাফিয়ে অভীষ্ট লক্ষ থেকে ছিটকে যেতে নয়। তিনি সবসময়ই ছিলেন শান্ত এবং ধৈর্যশীল সে আমি যতই নিরেট, স্বল্পবুদ্ধির হই না কেন, বিশ্বাস করুন, আমার নির্বুদ্ধিতা প্রায়ই তাঁর ধৈর্যচুতি ঘটাবার মতো হতো।

১৮৯৯ সালের ২৯ এবং ৩০ জুন আমি র‍্যাড্‌ক্লিফ কলেজে ভর্তির চূড়ান্ত পরীক্ষায় বসেছিলাম। প্রথম দিন আমার পরীক্ষা ছিল প্রাথমিক স্তরের গ্রিক এবং উচ্চ পর্যায়ের ল্যাটিন ভাষার, দ্বিতীয় দিন জ্যামিতি, বীজগণিত এবং উচ্চতর গ্রিক ভাষার পরীক্ষা।

কলেজ কর্তৃপক্ষ মিস সুলিভানকে আমার প্রশ্নপত্র পড়ে শোনানোর অনুমতি দেয়নি; সেজন্য পারকিনস্ ইনস্টিটিউশন ফর দ্য ব্লাইন্ডের একজন প্রশিক্ষক মি. ইউজিন সি. ভাইনিং নিয়োজিত হয়েছিলেন আমেরিকান ব্রেইলে প্রশ্নপত্রটার প্রতিরূপ তৈরি করতে। মি. ভাইনিং আমার কাছে অপরিচিত ছিলেন এবং ব্রেইল হরফের মাধ্যম ছাড়া আমার সাথে ভাব বিনিময় করতে পারতেন না। কলেজের প্রোক্টরও

www.amarboi.org

আমার অপরিচিত ছিলেন এবং আমার সাথে তিনি কোনোভাবেই ভাব বিনিময় করার চেষ্টা করেননি।

ব্রেইল হরফ ভাষাশিক্ষার ব্যাপারে সাহায্য করেছিল ভালোই কিন্তু যখন ভূগোল এবং বীজগণিতের ব্যাপার এল তখনই দেখা দিল অসুবিধা। আমি অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে বিভ্রান্ত এবং নিরুৎসাহিত হয়ে পড়লাম। বেশ খানিকটা মূল্যবান সময় নষ্ট হলো। বিশেষত বীজগণিতের বেলায়। এটা সত্যি যে আমি পরিচিত ছিলাম সাধারণভাবে ব্যবহৃত এই দেশের বর্ণমালা– ইংরেজি, আমেরিকান এবং নিউইয়র্ক পয়েন্টে বিভিন্ন চিহ্নসমূহ এবং প্রতীকসমূহ যেগুলো ব্যবহৃত হয় জ্যামিতি এবং বীজগণিতে সেগুলোকে তিনটি মেশিনের ক্ষেত্রে ব্যবহার ছিল একেবারে আলাদা ধরনের এবং আমি শুধু ইংরেজি ব্রেইল বর্ণমালা ব্যবহার করেছিলাম বীজগণিতের বেলায়।

পরীক্ষা শুরু হওয়ার দুদিন আগে মি. ভাইনিং আমার ব্রেইল হরফে নকল করা হার্ভার্ড-এর একটি পুরোনো বীজগণিতের প্রশ্ন পাঠিয়েছিলেন। আতঙ্কের মধ্যে আমি দেখলাম যে এটা ছিল আমেরিকান চিহ্ন এবং সঙ্কেত সম্বলিত। আমি সাথে সাথে চিহ্নগুলো ব্যাখ্যার জন্য বসে পড়লাম মি. ভাইনিংকে চিঠি লিখতে। আমি পরের ডাকেই আরও একটা প্রশ্নপত্র এবং একটি চিহ্নসমূহের সারণী পেলাম এবং বীজগণিত পরীক্ষার আগে ঐ চিহ্ন ও প্রতীক ব্যবহারের প্রণালী শিখতে বসে গিয়েছিলাম। কিন্তু বীজগণিত পরীক্ষার আগের দিন রাত্রে আমি যখন খুব জটিল কিছু প্রশ্নের উত্তরের জন্য সংগ্রাম করছিলাম, তখন ব্রেইল হরফে শনাক্ত করতে পারছিলাম না তিনটি বন্ধনী তথা প্রথম বন্ধনী, দ্বিতীয় বন্ধনী, তৃতীয় বন্ধনী এবং ধনুর্বন্ধনী ও বর্গমূল। আমরা দুজনেই– মি. কিথ্ এবং আমি হয়রানি আর বিপদবোধ করছিলাম পরের দিনের কথা ভেবে; যাই হোক, পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার কিছুক্ষণ আগেই আমরা কলেজে পৌঁছালাম, এবং মি. ভাইনিংকে দিয়ে আমেরিকান ব্রেইলে চিহ্নগুলো আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়ে নিলাম।

জ্যামিতিতে আমার প্রধান সমস্যা হয়েছিল যে আমি উপপাদ্যগুলো পংক্তি ছাপায় পড়তে অভ্যস্ত ছিলাম অথবা সেগুলো আমার হাতে বানান করা হতো এবং যদিও উপপাদ্যগুলো আমার ঠিক সামনেই ছিল, আমার কাছে ব্রেইলে লেখা সেগুলোই যেন কেমন বিভ্রান্তিকর মনে হচ্ছিল এবং পড়ার পর সেগুলোই মনে ধরে রাখতে পারছিলাম না। আবার যখন বীজগণিত নিয়ে বসলাম তখন তা জ্যামিতির চেয়েও বেশি কঠিন মনে হয়েছিল। সে সঙ্কেতগুলো আমি অতি সম্প্রতি শিখেছিলাম এবং আমি মনে করতাম, সেগুলোও আমাকে হতবুদ্ধি করে দিয়েছিল। তা ছাড়া টাইপরাইটারে আমি কী লিখেছিলাম তাও দেখে উঠতে পারিনি। আমি সবসময়ই আমার কাজ করতাম ব্রেইল যন্ত্রে অথবা মনে মনে। মুখে মুখে ও মনে মনে সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আমার ক্ষমতার উপর খুব বেশি বিশ্বাস রেখেছিলেন মি. কিথ্ এবং সম্ভবত ঐ কারণে আমাকে পরীক্ষার উত্তরপত্র লেখার ব্যাপারে প্রশিক্ষণ

www.amarboi.org

দেননি। ফলে আমার উত্তরপত্র লেখার ব্যাপারটা ছিল যন্ত্রণাদায়কভাবে ধীর এবং সেই কারণে কী করতে হবে তা বুঝে নেওয়ার জন্যে আমাকে উদাহরণগুলো বার বার পড়তে হতো। আমি এখনও ঠিক জানি না, সঠিক ভাবে আমি সমস্ত সঙ্কেতগুলো পড়তে পেরেছিলাম কিনা। সেই সময় আমার মাথা ঠাণ্ডা রাখা ছিল খুবই কঠিন।

এজন্য অবশ্য আমি দোষারোপ করতে চাই না কাউকে। র‍্যাড্‌ক্লিফ কলেজের কর্তৃপক্ষ অনুধাবন করতে পারেননি, তাঁরা কী ভীষণ কঠিন করে দিচ্ছিলেন আমার পরীক্ষাগুলো। এটাও তাঁরা বুঝতে পারেননি, কী অদ্ভুত ধরনের অসুবিধা আমাকে কাটিয়ে উঠতে হয়েছিল। যদি তাঁরা অনিচ্ছাকৃতভাবে আমার সামনে বাধা সৃষ্টি করেও থাকেন, আমার এই সান্ত্বনা আছে যে আমি সেই বাধাগুলো অতিক্রম করেছিলাম।

www.amarboi.org

বিশ

কলেজে ভর্তি হওয়ার সংগ্রাম শেষ হলো এবং ওই সময় আমি যখন ইচ্ছে কলেজে ভর্তি হতে পারতাম। কলেজে ভর্তি হওয়ার আগে অবশ্য এটা ঠিক করা হয়েছিল যে আমি আরও এক বছর মি. কিথ্-এর তত্ত্বাবধানে পড়াশোনা করব। এর ফলে ১৯০০ সাল শেষ হওয়ার আগে আমার কলেজে যাওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি।

আমি মনে করতে পারি র‍্যাড্‌ক্লিফ্ কলেজে আমার প্রথম দিনটির কথা। আমি এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করেছিলাম বহু বছর। এটা ছিল এমন একটা দিন যা আমার জন্য নানা আকর্ষণে পূর্ণ ছিল। একটা প্রবল শক্তি ছিল আমার মধ্যে, যা আমার বন্ধুদের যুক্তি পরামর্শসহ উৎসাহ দান থেকে শক্তিশালী ছিল। যা এমনকি অধিকতর শক্তিশালী ছিল আমার অন্তরের গভীর আকাঙ্ক্ষা থেকেও, সেটাই অনুপ্রাণিত করেছিল আমাকে, আমার শক্তিকে পরখ করতে সেই সব ছেলেমেয়েদের মানদণ্ডে, যারা দেখতে পায় আর পায় শুনতেও। আমি জানতাম অনেক বাধা আছে সেই পথে, তবু সেগুলোকে অতিক্রম করতে আমি আগ্রহী ছিলাম। আমি আমার হৃদয়ে গ্রহণ করেছিলাম সেই বিজ্ঞ রোমান নাগরিকের কথা যিনি বলেছিলেন, 'রোম থেকে নির্বাসিত হওয়ার অর্থ রোম নগরীর বাইরে থাকা ছাড়া আর কিছু নয়।' জ্ঞান জগতের রাজপথের প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আমি বাধ্য হয়েছিলাম অজানা পথ ধরে তার পথ-প্রান্তে ঘুরে বেড়াতে— এই যা। আমি জানতাম যে কলেজে আছে অনেক গুরুত্বহীন ক্ষুদ্র পথ, যেখানে আমি হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারব সেই মেয়েদের যারা চিন্তা করে, ভালোবাসে আর সংগ্রাম করে আমারই মতো।

আমি আমার পড়াশোনা শুরু করেছিলাম আগ্রহের সাথে। আমার সামনে আমি দেখেছিলাম একটা নতুন জগৎ, যা উন্মোচিত হচ্ছিল সৌন্দর্যে আর আলোর দীপ্তিতে। এবং আমি আমার মধ্যে একটা শক্তি অনুভব করলাম সব কিছু জানার। মনোজগতের এক বিস্ময়কর রাজ্যে আমি মুক্ত থাকব অন্য সকলের মতোই। এর লোকজন, দৃশ্যাবলি, আচার-আচরণ, আনন্দ, বিষাদ, সবই হবে সজীব স্পর্শযোগ্য এবং বাস্তব জীবনের ব্যাখ্যাকারী। শ্রেণিকক্ষগুলো মনে হতো মহান এবং জ্ঞানী ব্যক্তিত্বের মননে পরিপূর্ণ আর আমি ভাবতাম অধ্যাপকরা ছিলেন জ্ঞানের প্রতিমূর্তি। যদি আমি পরে অন্যকিছু জেনে থাকি তা আমি বলব না কাউকেই।

কিন্তু আমি অল্প দিনের মধ্যেই আবিষ্কার করলাম যে কলেজ আসলে আমার ধারণায় থাকা কল্পনার, রূপকথার কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়। অনেক রঙিন স্বপ্নরা, যারা আনন্দ দিত, আপ্লুত করত আমার অল্প বয়সের অভিজ্ঞতাকে, তারা আশ্চর্যজনকভাবে ম্লান হয়ে আসতে থাকল এবং 'বর্ণহীন হয়ে গেল সাধারণ দিনের

www.amarboi.org

আলোয়।' ক্রমেই আমি অনুভব করতে থাকলাম, কলেজে পড়তে যাওয়ায় অনেক অসুবিধা আছে।

তখন অনুভব করেছিলাম এবং এখনও করি তা হলো সময়ের অভাব। আগে আমার অন্তরাত্মা আর আমি চিন্তা করার ও গভীরভাবে বিচার বিশ্লেষণ করার সময় পেতাম। আমরা দুজনে একসাথে বসতাম কোনো কোনো সন্ধ্যায়, শুনতাম সুরমাধুরী অন্তরাত্মার, যা কেউ শুনতে পায় শুধু অবসর মুহূর্তে যখন কোনো প্রিয় কবির প্রিয় ধ্বনি স্পর্শ করত হৃদয়ের গভীরে ও প্রিয় কোনো তন্ত্রীকে, যা হয়ত তখনও পর্যন্ত অনাহত ছিল কোনো স্পর্শের অভাবে। কিন্তু কলেজে নিজের চিন্তা– ভাবনার সাথে কথাবার্তা, ভাববিনিময় করার সময় থাকে না কখনও, কোনোভাবে। মনে হতো লোকে কলেজে যায় শুধুই শিখতে, চিন্তা করতে নয়। যখন কেউ প্রবেশ করে শিক্ষার তোরণ দিয়ে, তখন সে বাইরে রেখে আসে তার প্রিয় আনন্দগুলোকে– তার একান্ততা, প্রিয় বইয়েরা, কল্পনা আর পাইন গাছের কানে কানে কথা বলাও। আমার কিছু সান্ত্বনা পাওয়া উচিত এই কথা ভেবে আমি সম্পদ সংগ্রহ করে রাখছি ভবিষ্যতের আনন্দের জন্য, কিন্তু আমি এতই অবিবেচক-অদূরদর্শী যে, ভবিষ্যতে কোনো অসময়ে লাগবে বলে সম্পদ জমিয়ে না রেখে তাকে পূর্ণভাবে উপভোগ করতে চাই হৃদয় ভরে এখনই, এই বর্তমানে।

আমার প্রথম বছরের শিক্ষার বিষয়গুলো ছিল ফরাসি ভাষা, জার্মান ভাষা, ইতিহাস, ইংরেজি রচনাশৈলী এবং ইংরেজি সাহিত্য। ফরাসি পাঠ্যক্রমে আমি পড়েছিলাম– কার্নেলী, মলিয়ের, রাসিন, আলফ্রে দ্য মুসে, স্যাঁতে বভ-এর মতো লেখকদের রচনার কিছু কিছু অংশ এবং জার্মান সাহিত্যে পড়েছিলাম গ্যেটে আর শিলারের লেখা। খুব দ্রুত পড়েছিলাম রোমান সাম্রাজ্যের পতন থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সমগ্র ইতিহাস আর সমালোচনামূলকভাবে পড়েছিলাম ইংরেজি সাহিত্যের মিলটনের কবিতাসমূহ এবং অ্যারিওপাজিটিকা।

আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করা হয় কলেজে আমি কীভাবে কাটিয়ে উঠেছিলাম সেই সব বিচিত্র পরিস্থিতি, যার মধ্যে আমাকে পড়তে হয়েছিল। ক্লাসে অবশ্য বলতে গেলে এক রকম নিঃসঙ্গ ছিলাম। অধ্যাপক মহাশয় এত দূরে থাকতেন, মনে হতো যেন টেলিফোনে কথা বলছেন। বক্তৃতাগুলো আমার হাতে বানান করে লেখা হতো যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি, ফলে বোঝার দৌড়ে থাকার জন্য অধ্যাপকের বক্তৃতার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যেত আমার কাছে। শব্দগুলো আমার হাতের ওপর দিয়ে দৌড়ে চলে যেত শিকারি কুকুর যেমন করে দৌড়ায় খরগোসের পেছনে, আর প্রায়ই ধরতে সফল হয় না তাকে। কিন্তু এ ব্যাপারে যারা ক্লাসে অধ্যাপকদের ভাষণ লিখে নেবার চেষ্টা করে, আমার মনে হয় আমার ব্যবস্থা তাদের থেকে খুব একটা খারাপ ছিল না। যদি মন ব্যস্ত থাকে যান্ত্রিকভাবে শোনা এবং শোনা কথাগুলো কাগজে লিখে নেওয়ায় পড়ি কি মরি করে, তবে আমি মনে করি না যে বিষয়টি পড়ানো হচ্ছে এবং যেভাবে তা পড়ানো হচ্ছে তার দিকে খুব মনোযোগ দেয়া যায়। বক্তৃতা শোনার সময় আমি

www.amarboi.org

'নোট' নিতে পারতাম না কারণ তখন আমার দু'হাতই ব্যস্ত থাকত শোনায়। সাধারণত বাড়ি ফেরার পর ক্লাসের বক্তৃতায় যেটুকু মনে থাকত তাই লিখে রাখতাম। আমি বইয়ের অনুশীলনীর উত্তর, ক্লাসে প্রতিদিনের আলোচিত বিষয়বস্তুসমূহ, সমালোচনা এবং ক্লাসের পরীক্ষা, ষান্মাসিক পরীক্ষা, বাৎসরিক পরীক্ষার উত্তর টাইপ রাইটারে লিখে রাখতাম, যাতে আমি কত কম জানি তা বুঝতে অধ্যাপক মশায়দের কোনো অসুবিধা না হয়। যখন আমি ল্যাটিন ছন্দশাস্ত্র পড়তে আরম্ভ করি তখন একটি পদ্ধতি আবিষ্কার এবং তা ব্যাখ্যা করেছিলাম আমার অধ্যাপক মহাশয়ের কাছে, সেটা ছিল একটা সাংকেতিক চিহ্ন সংক্রান্ত নিয়ম, যা দিয়ে ছন্দ আর মাত্রার পার্থক্য বুঝতে পারা যেত।

আমি হ্যামন্ড টাইপরাইটার ব্যবহার করি। আমি অনেক রকমের মেশিন ব্যবহার করে দেখেছি এবং এটাও দেখেছি যে, হ্যামন্ডই সবচেয়ে ভালো আমার বিশেষ ধরনের চাহিদা মেটানোর পক্ষে। এই যন্ত্রে খুলে নেওয়া যায় এমন অক্ষরের মাকু ব্যবহার করা যায়। একজন অনেক ধরনের বর্ণ, অক্ষর, চিহ্ন সে গ্রিক বা ফরাসি ভাষাই হোক বা অঙ্কই হোক তার প্রয়োজন মতো মাকুটি বা শাটেলটি টাইপ মেশিনে লাগিয়ে নিতে পারবে। এটা না থাকলে আমি কলেজে পড়তে যেতে পারতাম কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় বইয়ের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক বইই ছাপা হয় অন্ধদের জন্যে। আর আমি বাধ্য হয়েই হাতে বানান করিয়ে নিতাম সেই বইগুলো। ফলে, অন্য মেয়েদের থেকে পড়া তৈরি করতে আমার অনেক বেশি সময় লাগত। হাত দিয়ে পড়তে সময় লাগত বেশি, আর আমার যে বিহ্বলতা ছিল অন্য মেয়েদের তা ছিল না। এমন সময় গেছে, যে সময় আমাকে অনেক বেশি যত্ন করে শিখতে হতো অন্যদের থেকে। তখন আমার মন উত্তেজিত হয়ে ওঠত এই চিন্তায় যে আমাকে বাধ্য হয়ে কিছু অনুচ্ছেদ পড়তে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যয় করতে হচ্ছে, যেখানে অন্য মেয়েরা দিব্যি সময় কাটিয়ে দিচ্ছে হেসে, গান গেয়ে আর নেচে– এই ভাবনা আমাকে বিদ্রোহী করে তুলত; কিন্তু অনতিবিলম্বেই আমি ফিরে পেতাম আমার মনের প্রফুল্লতা, আর আমার মন থেকে হেসে উড়িয়ে দিতাম সব অসন্তোষ। কেননা, যে যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে চায়, তাকে শেষ পর্যন্ত একাকীই অতিক্রম করতে হয় 'অসুবিধার পাহাড়', আর যেহেতু চূড়ায় পৌঁছনোর কোনো সহজ পথ নেই, সেই কারণে, আমাকে সে-পথ করে নিতে হবে আঁকাবাঁকা পথ ধরে নিজের মতো করে। অনেক সময়ই আমি পিছলে যাই, পিছিয়ে পড়ি, আমি আটকে পড়ি অদৃশ্য বাধার কিনারায়। আমি ধৈর্য হারাই, ফিরেও পাই আবার এবং সচেষ্ট হই। আমি ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে চলি, কিছু অধিগত করি, উদ্দীপ্ত হই, হই আরো আগ্রহীও। আর যখন উঠি আর একটু উপরে, দেখতে পাই বিস্তৃত দিগন্তরেখা। আসলে, প্রতিটা সংগ্রামই এক একটা বিজয়। আর একটু প্রচেষ্টায় আমি পৌঁছে যাব বর্ণোজ্জ্বল মেঘের কাছে, নীল আকাশের গভীরে, আমার আকাঙ্ক্ষার উন্নত পাহাড়ে। অবশ্য এই সংগ্রামে আমি

www.amarboi.org

একা নই সবসময়, নই নিঃসঙ্গও। মি. উইলিয়াম ওয়েড এবং মি. ই. ই. অ্যালেন, যিনি অধ্যক্ষ ছিলেন পেনসিলভানিয়া ইনস্টিটিউট ফর দ্য ইনস্ট্রাকশন অব দ্য ব্লাইন্ড-এর, আমার প্রয়োজনীয় বহু বই মুদ্রিত করে পাঠিয়েছিলেন ব্রেইল হরফে। তাঁদের সহৃদয় ভাবনা এক অসাধারণ সাহায্য আর উৎসাহ ছিল আমার কাছে, যা তাঁরা জানবেন না কোনোদিনও।

গত বছর ছিল র‍্যাড্‌ক্লিফে আমার দ্বিতীয় বছর। আমি ঐ সময় অধ্যয়ন করেছিলাম ইংরেজি রচনাশৈলী, বাইবেলও পড়েছিলাম ইংরেজি রচনাশৈলী হিসাবে। এছাড়া আমাকে পড়তে হয়েছিল আমেরিকা এবং ইউরোপের শাসন ব্যবস্থা। হোরেসের ওডস্ এবং ল্যাটিন কমেডি। রচনার ক্লাসটিই আমার কাছে ছিল সবচেয়ে আনন্দদায়ক এবং উপভোগ্য। এই ক্লাসটি ছিল খুবই প্রাণবন্ত। বক্তৃতাগুলো সব সময়ই ছিল আকর্ষণীয়, প্রাণবন্ত এবং সরস; আমি যতজন প্রশিক্ষকের সান্নিধ্যে এসেছিলাম, তার মধ্যে মি. চার্লস টাউনসেন্ড কোপল্যান্ড অন্য সকলের চেয়ে দক্ষতার সাথে সাহিত্যের মৌলিক, সজীব এবং শক্তির রূপটি ছাত্রদের সামনে তুলে ধরতেন। মাত্র এক ঘন্টার ক্লাসেই অনাবশ্যক কোনো ব্যাখ্যা না দিয়েই তিনি ছাত্রদের মহান স্রষ্টাদের রচনার চিরন্তন সৌন্দর্যরস পান করাতেন। ছাত্ররা প্রাণভরে উপভোগ করত সেই সব মহান স্রষ্টাদের অনুপম সৃষ্টি। তারা Jahweh বা Elohim-এর অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে হৃদয়ে উপভোগ করত ওল্ড টেস্টামেন্টের মধুর বজ্রবাণী। তারা ঘরে ফিরে যেত এই উপলব্ধি নিয়ে যে, 'তুমি পেয়েছ সেই পূর্ণতার আভাস যেখানে একাত্ম হয়ে বাস করে আত্মা আর দেহ অবিনশ্বর ঐকতানে; সত্য এবং সৌন্দর্য যেখানে প্রাচীন 'সময় বৃক্ষে' বিকশিত হয়ে উঠেছে নবরূপে।

ওই বছরটাই ছিল সবচেয়ে সুখের। কারণ যেসব বিষয় আমার আকর্ষণীয় মনে হয়, ওই সময় সেগুলোই পড়েছিলাম। বিশেষ করে আমাকে আকর্ষণ করেছিল, অর্থনীতি, এলিজাবেথের কালের সাহিত্য, শেক্সপিয়ার সবই পড়েছিলাম অধ্যাপক জর্জ এল. কিটারেজের তত্ত্বাবধানে এবং দর্শনের ইতিহাস পড়েছিলাম অধ্যাপক জোসিয়া রয়েসের কাছে। দর্শনশাস্ত্রের মাধ্যমে সহানুভূতিশীল উপলব্ধি সম্পন্ন হয়ে আমরা প্রবেশ করতে পারি দূরে ফেলে আসা কোনো ঐতিহ্যে এবং অন্যান্য চিন্তাধারাতেও, যেগুলোকে কিছুকাল আগেও অপরিচিত এবং অযৌক্তিক বলে মনে হয়েছিল।

কিন্তু কলেজ, যাকে আমি অ্যাথেন্স-এর সার্বজনীন শিক্ষাকেন্দ্রের অনুরূপ বলে মনে করতাম, এখন দেখতে পেলাম সেটা তা নয়। এখানে কেউ মহান এবং বিজ্ঞ মানুষদের সান্নিধ্যে আসতে পারে না, পারে না তাঁদের মুখোমুখি হতেও বা সজীব স্পর্শ অনুভব করতে। এটা সত্য যে তাঁরা আছেন সেখানেই; তবে তাঁদের রাখা হয়েছে মমি করে। আমাদের নিশ্চিতভাবেই সেই মমিগুলো টেনে বের করে আনতে হবে শিক্ষার প্রাচীরের ফাটল থেকে, ব্যবচ্ছেদও করতে হবে এবং বিশ্লেষণ করতে হবে নিশ্চিত হওয়ার জন্য যে আমরা সত্যিই পেয়েছি একজন মিলটন অথবা একজন

www.amarboi.org

ইসাইয়াকে, তাদের কোনো সুচতুর অনুকরণকে নয়। অনেক পণ্ডিতই ভুলে যান, আমার মনে হয়, এই সত্যটা মহৎ সাহিত্য উপভোগ করা নির্ভর করে যতটা আমাদের সহমর্মিতার গভীরতার ওপর, ততটা বোধশক্তির ওপর নয়। আসলে সমস্যা হলো তাঁরা পরিশ্রম করে যে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেন, তার অল্প অংশই আমাদের স্মৃতিতে ধরা থাকে। মন তাদের ঝেড়ে ফেলে দেয়, গাছের শাখা যেমন ঝেড়ে ফেলে দেয় বেশি পাকা ফল। একটা ফুলকে, শিকড়কে, কাণ্ডকেও আর তাদের বেড়ে ওঠার পদ্ধতিও জানা সম্ভব এবং তবুও সে জানায়– নাও থাকতে পারে স্বর্গীয় শিশিরে সদ্যস্নাত কোনো ফুলের সৌন্দর্য উপলব্ধির কথা। আমি অধৈর্য হয়ে বারবার প্রশ্ন করি, 'কেন নিজেকে ব্যস্ত রাখব এসব ব্যাখ্যা করার আর অনুমান করার মধ্যে?' তারা উড়ে উড়ে চলে এখানে ওখানে আমার চিন্তার আকাশে দৃষ্টিহীন পাখিদের মতো ডানাও ঝাপটায়, যে ডানা অপারগ তার কাজ করায়। আমি আসলে কোনো বিখ্যাত রচনাবলি সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞানলাভে বিরোধী নই। আমি আপত্তি করি ক্লান্তিকর মন্তব্যের আর বিভ্রান্তিকর সমালোচনাসমূহের যা কেবল শেখায় একটা জিনিসই : যত মানুষ আছে মতও আছে ততগুলোই। কিন্তু যখন অধ্যাপক কিট্রেজের মতো একজন বিখ্যাত পণ্ডিত কোনো মহান লেখকের বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করেন, তাঁর সেই ব্যাখ্যা যেন 'নতুন দৃষ্টি দেয় অন্ধকে।' মনে হয় তিনি যেন আমাদের বোধের সীমায় সশরীরে ফিরিয়ে আনতেন শেক্সপিয়ারকে।

এমন অনেক সময় এসেছিল আমার ইচ্ছে হতো আমার পড়ার বিষয়ের অর্ধেক জিনিস ঝাড়ু দিয়ে ফেলে দিই, কারণ পরিশ্রান্ত মন কখনই উপভাগ করতে পারে না যা সে সংগ্রহ করেছে বেশি দামে। এটা অসম্ভব বলে আমার মনে হয় যে, একদিন চার অথবা পাঁচটা বিষয়ের বই এবং যেগুলো বিভিন্ন ভাষায় আর বিভিন্ন বিষয়ে লেখা, যেগুলো পড়ে বুঝতে গেলে সে বইগুলো যে উদ্দেশ্যে লেখা তা ব্যাহত হতে বাধ্য। কেউ যখন খুব তাড়াতাড়ি এবং কিছুটা ঘাবড়ে গিয়ে লেখা পড়ে-পরীক্ষার কথা চিন্তা করে, অথবা পরীক্ষার কথা ভাবে, তখন তার মস্তিষ্ক এমন সব টুকরো টুকরো জিনিস দিয়ে ভরিয়ে ফেলে যেগুলো পরে আর বিশেষ কোনো কাজে লাগে না। বর্তমানে আমার মন অগোছাল, অসম্পৃক্ত জিনিসে পূর্ণ যে আমি হতাশ হয়ে পড়ি এই ভেবে যে, ওগুলো আর কোনো দিনই আমি গুছিয়ে উঠতে পারব না। যখন আমি, এক সময়ে যা আমার মানসলোক ছিল, তাতে প্রবেশ করতে যাই, তখনই আমি অনুভব করি চিনা ভাষার প্রবাদ বাক্যের মতো, 'চিনামাটির জিনিসপত্রের দোকানে ক্ষ্যাপা ষাঁড়।' জ্ঞানের হাজারো রকমের টুকিটাকি জিনিস আমার মাথায় আছড়ে পড়তে থাকে শিলাপিণ্ডের মতো এবং আমি যখন সেগুলো থেকে বাঁচতে চেষ্টা করি, তখন পড়ার বিষয়ের ভূতেরা এবং কলেজ নামক জলের ভূতেরা আমাকে তাড়া করে আসে, যতক্ষণ না আমার মনে হয়, ওহো, আমাকে কি এই দুষ্ট বুদ্ধির জন্য ক্ষমা করা যাবে! যখন আমি ভাবি যে, যাদের পূজা করতে এসেছিলাম সেই বিগ্রহগুলোকেই আমি হয়তো চূর্ণ করে দেব।

www.amarboi.org

কিন্তু আমার কলেজ জীবনে পরীক্ষাগুলো ছিল প্রধান আতঙ্ক। যদিও আমি তাদের মুখোমুখি হয়েছি অনেকবার এবং ছুঁড়ে ফেলেছি তাদের মাটিতে এবং করেছি আহতও তবুও তারা আবার উঠে এসে ভয় দেখিয়েছে আমাকে যতক্ষণ না বব অ্যাক্রেস-এর মতো আমার মনে হয়েছে সাহস চুঁইয়ে চুঁইয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে আমার আঙুলের ডগা দিয়ে। এইসব কঠিন পরীক্ষাগুলো অনুষ্ঠিত হওয়ার আগের কয়েকদিন ব্যয় হতো রহস্যময় সব সূত্র মুখস্থ করতে আর মনে রাখা শক্ত এমন সব সন তারিখ মুখস্থ করতে যতক্ষণ না মনে হতো বই ও বিজ্ঞান এবং তুমি সমাহিত হচ্ছ গভীর সমুদ্রের নিচে।

অবশেষে সেই আতঙ্কের সময় এসে হাজির হলো, আর তুমি নিশ্চিতভাবেই হবে ভাগ্যবান ব্যক্তি যদি তুমি নিজেকে প্রস্তুত বলে মনে করতে পার এবং যদি তুমি সঠিক সময়ে তোমার স্বাভাবিক চিন্তাগুলোকে ডেকে নিতে পার তোমার চরম প্রচেষ্টায়। এরকম প্রায়ই ঘটে যে, তোমার জরুরি আহ্বান থেকে যায় উপেক্ষায়, অমনোযোগে। এটাই সবচেয়ে বিভ্রান্তিকর এবং বিরক্তিকর, ঠিক যেই মুহূর্তে তোমার প্রয়োজন স্মৃতিশক্তি আর সূক্ষ্ম বিবেচনাবোধ এবং বাছাই করে নেবার ক্ষমতা, তখনই এই সব গুণ বা ক্ষমতাগুলো পাখা মেলে উড়ে চলে যায়। কী জানি, কোথা! যে তথ্যগুলোকে সে জোগাড় করেছিল সীমাহীন পরিশ্রমে আর অসুবিধায়, তারা চলে যায় প্রয়োজনের মুহূর্তে।

'হাস্ এবং তার কাজ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।' হাস্ কে ছিলেন? এবং কী করেছিলেন তিনি? নামটা আশ্চর্যজনকভাবে পরিচিত মনে হচ্ছে। তুমি তন্নতন্ন করে খুঁজলে তোমার ইতিহাসের তথ্যের জমা খরচ-এর বিবরণী, যাকে রেখেছিলে সাজিয়ে-গুছিয়ে, যেমন তুমি খোঁজ ছেঁড়া কাপড়ের ব্যাগে রাখা এক টুকরো রেশমী কাপড়। তুমি নিশ্চিত তোমার মনের মধ্যে ওপরের দিকে রাখা তথ্যের মধ্যে আছে ওটা– এই সেদিনও তো ওটাকে দেখেছিলে যখন খুঁজেছিলে খ্রিষ্টীয় ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সূচনা পর্বের ইতিহাস। কিন্তু সেটা এখন আছে কোথায়? তুমি একবার খোঁজার পর আবারও খুঁজলে সেটাকে জ্ঞান-এর নানা টুকরোর মধ্যেও– বিপ্লব, অনৈক্য, গণহত্যা, সরকারি নানা পদ্ধতি তার মধ্যেও। কিন্তু হাস্– কোথায় সে? তুমি বিস্ময়ে বিহ্বল হও সেই সবকিছু দেখে, যেসব জিনিস তুমি জান তার কিছুই নেই পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে। মরিয়া হয়ে তুমি তখন তথ্যের জমা খরচের বিবরণীটি আঁকড়ে ধর, ওই সব বিবরণী থেকে সবকিছু বের করে আন এবং তখন দেখতে পাও, যাকে খুঁজছো, সে রয়েছে এক কোণে, শান্তভাবে ব্যক্তিগত চিন্তায় মগ্ন হয়ে, সচেতন না হয়ে তোমার সর্বনাশের যা ডেকে এনেছে সে-ই!

ঠিক সেই সময়ে প্রোক্টর এসে জানান, পরীক্ষার সময় শেষ হয়ে গেছে। একটা প্রচণ্ড বিরক্তির অনুভূতি নিয়ে তুমি আবর্জনার স্তূপে একটা লাথি মেরে সেটাকে সরিয়ে দাও ঘরের কোণে, আর ফিরে যাও বাড়ি, তোমার চিন্তা চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে থাকে এক বৈপ্লবিক চিন্তায়, পরিকল্পনায় অধ্যাপক মশায়ের প্রশ্ন করার ঐশ্বরিক ক্ষমতাটিকে খারিজ করার, আর তা হলো, উত্তরদাতার সম্মতি না নিয়ে প্রশ্ন করার ক্ষমতা।

www.amarboi.org

আমার মনে হচ্ছে যে এই অধ্যায়ের শেষ দু-তিন পাতায় আমি কিছু উপমা ব্যবহার করেছি যেগুলো আমার দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপ করবে। ওহো, এই তো ওরা রয়েছে এখানেই– মিশ্রিত রূপকগুলো, বিদ্রূপ করছে আমাকে এবং আত্ম-অহঙ্কারে গট গট করে হেঁটে যাচ্ছে আমার সামনে দিয়ে আর আঙুল তুলে দেখাচ্ছে উপমাগুলোকে : 'শিলাবৃষ্টির দ্বারা আক্রান্ত ষাঁড়টি', 'নীরস চোখের একটা জুজু' যার প্রজাতি অজানা। আমাকে বিদ্রূপ করতে দাও ওদের। আসলে ঐ শব্দগুলো আমি যে পরিবেশে থাকি তার যথাযথ বর্ণনা দেয়– বর্ণনা করে চিন্তাগুলোর পারস্পরিক ঠোকাঠুকি, হোঁচট খেয়ে পড়া এইসব। আমি ওগুলোর দিকে পিটপিট করে তাকাব একবার, আর ইচ্ছাকৃতভাবে এমন একটা পারিপার্শ্বিকতা, আবহাওয়া সৃষ্টি করব যাতে মনে হবে যে কলেজ সম্পর্কে আমার ধারণার পরিবর্তন হয়েছে।

যে সময়ে র‍্যাড্‌ক্লিফে পড়তে আসার দিনগুলো ছিল ভবিষ্যতের গর্ভে, তখন সেই দিনগুলোকে ঘিরে ছিল একটা রোমান্সের বর্ণবলয় বা দীপ্তি; যা তারা হারিয়ে ফেলেছে এখন, 'কিন্তু' রোমান্টিক কল্পনা থেকে বাস্তবে উত্তরণের পথে আমি শিখেছি অনেক কিছু, যা আমি কখনই জানতে পারতাম না, যদি না আমি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতাম। সেগুলোর একটা হচ্ছে মহার্ঘ বিজ্ঞান, ধৈর্যগুণ, যা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, শিক্ষাকে আমাদের মনে করা উচিত একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া যেমন আমরা হাঁটি গ্রামের পথে পথে, অবকাশের আলস্যে আর আমাদের মন থাকবে অতিথিপরায়ণতায় পূর্ণ, মুক্ত ও উদার, যা সকল প্রকার ধ্যান-ধারণাকে গ্রহণ করবে অন্তরে– সাদরে নেবে আপন করে। তেমন জ্ঞানই পরিপ্লাবিত করে আমাদের অদেখা অন্তরাত্মাকে শব্দহীন জোয়ারের জলের মতো। 'জ্ঞানই শক্তি'। বরং বলা যায়, জ্ঞানই প্রকৃত আনন্দ, কারণ গভীর, বিস্তৃত জ্ঞান লাভ করার অর্থ, মিথ্যার পরিবর্তে সত্য উদ্দেশ্যকে জানি, বুঝি, সনাক্ত করতে পারি অনুন্নত থেকে মহৎকে, যে সব চিন্তাধারা এবং কার্যধারা আর কীর্তি চিহ্নিত করেছে মানুষের প্রগতিকে, সেগুলোকে জানার অর্থ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসা মানব সভ্যতার হৃৎস্পন্দন অনুভব করা; আর যদি কেউ মানুষের স্বর্গের উচ্চতায় পৌঁছবার অপার বাসনা আর আপ্রাণ চেষ্টা না করতে সমর্থ হয়, তবে মনে করতে হবে নিশ্চিতভাবেই সে এক বধির, যে মানব জীবনের ঐকতান শোনার আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত।

www.amarboi.org

একুশ

আমি এ পর্যন্ত শুধু আমার জীবনের ঘটনাগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছি, কিন্তু আমি এটা প্রকাশ করিনি যে আমি বই-এর ওপর কতটা নির্ভরশীল ছিলাম শুধুমাত্র আনন্দ পাওয়ার কিন্তু পাণ্ডিত্য অর্জনের জন্য নয়, যা নিশ্চিতভাবেই যাঁরা বই পড়েন তাঁরা পেয়ে থাকেন, বরং সেই শিক্ষা লাভ করার জন্য যা অন্যদের কাছে আসে তাঁদের চোখ এবং কানের মাধ্যমে। বাস্তবে, আমার শিক্ষার ক্ষেত্রে বই অনেক বেশি অর্থ বহন করে এনেছিল অন্য সকলের চেয়ে। তাই, আমি ফিরে যাবো সেই সময়ে যখন আমি বই পড়া শুরু করেছিলাম।

আমি আমার জীবনে প্রথম কোনো সুসংবদ্ধ কাহিনী পড়েছিলাম ১৮৮৭ সালের মে মাসে। তখন আমি ছিলাম সাত বছর বয়সের। আর সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত ছাপা বই-এর পাতার আকারে যা কিছু আমার ক্ষুধার্ত আঙুলের ডগার নাগালে এসেছে, তার সব কিছুই গোগ্রাসে গিলেছি। আমি ইতোমধ্যেই বলেছি যে আমার শিক্ষার প্রথম দিকের বছরগুলোতে আমি নিয়মিত পড়াশোনা করিনি এবং পড়িনি কোনো নিয়ম মেনেও।

প্রথমদিকে আমার অল্প কয়েকটা মাত্র বই ছিল ব্রেইল হরফে– প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক, ছোটদের জন্য একটি গল্প সংকলন এবং পৃথিবী সম্বন্ধে লেখা একটা বই 'আমাদের পৃথিবী'। আমার মনে হয় সবশুদ্ধ ক'খানা বই-ই ছিল আমার, কিন্তু আমি সেই বই ক'খানাই বার বার পড়তাম ফলে সেগুলোর উঁচু অক্ষরগুলো এতো পুরোনো হয়ে গিয়েছিল এবং ক্ষয় হয়ে গিয়েছিল যে, আমি প্রায় ওগুলো বুঝে উঠতেই পারতাম না। কখনও কখনও মিস সুলিভান তাঁর জানা ছোট্ট গল্প আর কবিতা আমাকে পড়ে দিতেন আমার হাতে বানান করে করে। আমি অবশ্য বেশি পছন্দ করতাম নিজে নিজে পড়তে, কারণ যে জিনিসগুলো আমাকে আনন্দ দিত, সেগুলো আমি বারবার পড়তে ভালোবাসতাম।

প্রথমবার বস্টনে বেড়াতে যাওয়ার সময় থেকেই আমি যথার্থ মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা শুরু করেছিলাম। আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল প্রতিদিনের কিছুটা সময় লাইব্রেরিতে কাটানোর। ওখানে থাকা এক বই-এর আলমারি থেকে অন্য বই-এর আলমারির কাছে ইতস্তত ঘুরে বেড়ানোর আর আলমারির যে বই-এর ওপর আমার আঙুল পড়তো, তা আলমারি থেকে নামানোরও। আমি পড়তাম ঠিকই, তবে তাতে আমি হয়ত বুঝতে পারতাম দশটা শব্দের মধ্যে একটা শব্দ অথবা প্রতি পাতায় মাত্র দুটি শব্দ। শব্দগুলোই আকর্ষণ করত আমাকে; কিন্তু আমি যা পড়তাম তা মনে রাখার জন্য আমার কোনো সচেতন প্রয়াস ছিল না। যা হোক, সেই সময় আমার মন নিশ্চয়ই সহজে প্রভাবিত হতো, কারণ সে স্মৃতিতে অনেক শব্দ এবং পূর্ণবাক্য

www.amarboi.org

কীভাবে ধরে রেখেছিল যাদের অর্থ সম্পর্কে আমার সামান্যতম ধারণাও ছিল না; পরবর্তীকালে আমি যখন কথা বলতে এবং লিখতে শুরু করলাম, তখন এই শব্দগুলো এবং বাক্যগুলোও অতি স্বাভাবিকভাবেই উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিত বিদ্যুৎ চমকের মতো, তার ফলে আমার বন্ধুরা আমার শব্দভাণ্ডারের ঐশ্বর্য দেখে বিস্মিত হতো। আমি নিশ্চয়ই অনেক বই-এর অংশবিশেষ পড়েছিলাম এবং বহু সংখ্যক কবিতাও মুখস্থ করেছিলাম উপলব্ধি করা যায় না এমন উপায়ে, যতদিন না পর্যন্ত আবিষ্কার করেছিলাম 'লিটল লর্ড ফন্টলেরয়'। এবং ওটাই ছিল প্রথম বই যা আমি বুঝে পড়েছিলাম।

একদিন আমার শিক্ষিকা আমাকে লাইব্রেরির এক কোণে বসে একাগ্র চিত্তে 'দ্য স্কারলেট লেটার' পড়তে দেখলেন। আমি তখন প্রায় আট বছরের। আমার মনে আছে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমার 'ছোট পার্ল'-কে ভালো লাগে কিনা এবং তিনি আমার কাছে ব্যাখ্যা করেছিলেন কিছু শব্দ, যেগুলো আমাকে হতবুদ্ধি করেছিল। তারপর তিনি আমাকে বললেন যে তাঁর কাছে একটি ছোট ছেলে সম্বন্ধে একটা চমৎকার গল্প আছে, যেটা তাঁর নিশ্চিত ধারণা, আমি 'দ্য স্কারলেট লেটারের' চেয়ে বেশি পছন্দ করব। সেই গল্পটার নাম 'লিটল লর্ড ফন্টলেরয়', এবং তিনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন যে তিনি সেটা আমাকে পড়ে শোনাবেন পরের গ্রীষ্মকালে। কিন্তু আমরা আগস্ট মাসের আগে গল্পটা পড়া আরম্ভই করতে পারিনি। সমুদ্রতীরে আমার অবস্থানের প্রথম কয়েক সপ্তাহ পূর্ণ ছিল এত আবিষ্কার এবং উত্তেজনায় যে, আমি কোনো বই-এর অস্তিত্বের কথাই ভুলে গিয়েছিলাম। তারপর আমার শিক্ষিকা আমাকে অল্প সময়ের জন্য ছেড়ে বস্টন গিয়েছিলেন কয়েকজন বন্ধুর সাথে দেখা করতে।

তিনি ফিরে আসার পর যে কাজটা আমরা প্রথমেই করেছিলাম, তা হলো 'লিটল লর্ড ফন্টলেরয়' গল্পটা পড়তে শুরু করা। আমি পরিষ্কারভাবে মনে করতে পারি সেই সময় এবং সেই স্থানের কথা, যখন আমরা শিশুদের জন্য লেখা মনোমুগ্ধকর গল্পের প্রথম অংশের অধ্যায়গুলো পড়েছিলাম। সময়টা ছিল আগস্ট মাসের এক উষ্ণ বিকাল। আমরা দু'জনে বসেছিলাম দড়ির তৈরি একটা দোলনায় যেটা বাড়ির অল্প দূরেই দুটি বিশাল পাইন গাছ থেকে ঝোলানো ছিল। দুপুরে খাবার পর আমরা বাসন ধোয়ার কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলেছিলাম, যাতে গল্পটা পড়ার জন্যে বিকেলের দিকে যতটা সম্ভব বেশি সময় পাওয়া যায়। আমরা যখন বড় বড় ঘাসের মধ্যে দিয়ে দ্রুত হেঁটে দোলনার কাছে এগিয়ে যাচ্ছিলাম তখন ফড়িং-এর ঝাঁক আমাদের চারপাশে ভিড় করে এসেছিল এবং আমাদের জামা-কাপড়ে আটকে ফেলছিল নিজেদের। আমার শিক্ষিকা আমরা দোলনায় বসার আগে ওগুলোকে তুলে ফেলে দেওয়ার জন্য জোর করেছিলেন, কিন্তু আমার মনে হয়েছিল, তা হবে একটা অপ্রয়োজনীয় সময় নষ্ট মাত্র। দোলনাটা ঢাকা পড়েছিল পাইন গাছের পাতায়, কারণ যখন আমার শিক্ষিকা বাইরে থাকতেন; তখন ওটা কখনও ব্যবহার করা হয়নি। উষ্ণ

www.amarboi.org

সূর্যকিরণ পড়েছিল পাইন গাছগুলোর ওপরে, আর তা বের করে আনছিল পাইনের সুবাস। বাতাস ভরপুর ছিল সুগন্ধে, তাতে মিশেছিল সমুদ্রের তীব্র কটুগন্ধও। আমরা গল্প পড়া শুরু করার আগে যে বিষয়গুলো আমি বুঝতে পারবো না বলে তাঁর জানা ছিল, মিস সুলিভান সেগুলো ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং আমাদের পড়ার মাঝে মাঝে অপরিচিত শব্দগুলো ব্যাখ্যা করেছিলেন। গল্পের প্রথম দিকে এমন অনেক শব্দ ছিল যেগুলো আমি জানতাম না, ফলে বই পড়ায় বারবার বাধা পড়ছিল; কিন্তু যে মুহূর্তে আমি গল্পের পরিস্থিতিটা সম্পূর্ণ বুঝতে পারলাম, তখন গল্পের মধ্যে এতটাই তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম যে, শুধুমাত্র শব্দগুলোর দিকে আমার কোনো লক্ষই ছিল না এবং এরপরেও মিস সুলিভান যখন ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন মনে করছিলেন, সত্যি বলতে কী তখন আমি অধৈর্য হয়ে উঠেছিলাম। তাঁর আঙুলগুলো এতটাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে, আর বানান করে লিখতে পারছিল না, তখন জীবনে সেই প্রথম বার আমার মনে দেখা দিয়েছিল একটা গভীর যন্ত্রণার, বঞ্চনার অনুভব। আমি বইটা তুলে নিলাম দুহাতে, আর অনুভব করতে চেষ্টা করলাম ব্রেইল অক্ষরগুলো এক তীব্র ও গভীর আকুলতা নিয়ে, যা আমি ভুলতে পারবো না কখনও।

পরে আমার আন্তরিক অনুরোধে মি. অ্যানাগ্‌নস এই কাহিনীটি ব্রেইল হরফে মুদ্রিত করে দিয়েছিলেন এবং আমি সেটা বারবার পড়ে প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছিলাম, আর আমার শৈশব জুড়ে 'লিটল লর্ড ফন্টলেরয়' ছিল এক মধুর ও প্রিয় সঙ্গী। একঘেয়ে লাগতে পারে এমন আশঙ্কা থাকলেও আমি এইসব ঘটনা এত বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করলাম এই কারণে যে এগুলো আমার এর আগের দিকে পড়া অস্পষ্ট, মূক এবং বিভ্রান্তিকর স্মৃতির মধ্যে তুলনামূলকভাবে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

'লিটল লর্ড ফন্টলেরয়' পড়ার সময় থেকেই আমার বই-এর প্রতি প্রকৃত আগ্রহের সূত্রপাত। পরবর্তী দু'বছর আমি বাড়িতে এবং বস্টনে বেড়াতে গিয়ে অনেক বই পড়েছি। আমি এখন আর মনে করতে পারি না, সেই বইগুলো কী ছিল অথবা কীভাবেই বা পড়েছিলাম সেগুলো। কিন্তু আমি জানি যে তাদের মধ্যে ছিল 'গ্রিক হিরোজ' লা ফন্টেইনের 'ফেব্‌লস', 'ওয়ান্ডার বুক', 'বাইবেল স্টোরিজ', ল্যাম্-এর 'টেলস্ ফ্রম শেক্সপিয়ার', ডিকেন্-এর লেখা 'অ্যা চাইল্ড্‌স হিস্টর অব ইংল্যান্ড,' 'দ্য অ্যারাবিয়ান নাইটস্', 'দ্য সুইস্ ফ্যামিলি রবিন্‌সন্', 'দ্য পিলগ্রিমস্ প্রোগ্রেস্', 'রবিনসন ক্রুশো', 'লিটল উমেন্' এবং 'হেইডি'। 'হেইডি' ছিল একটি চমৎকার ছোটগল্প, যেটা আমি পরে জার্মান ভাষায় পড়েছিলাম। এই সব বই আমি পড়েছিলাম অধ্যয়ন এবং খেলাধুলার ফাঁকে ফাঁকে আর তাতে পেয়েছি গভীর থেকে গভীরতর আনন্দের স্বাদ। ওই বইগুলো আমি গভীরভাবে অধ্যয়ন করিনি, করিনি বিচার-বিশ্লেষণও— আমি জানতাম না ওগুলো ভালো লেখা ছিল কিনা; আমি কখনও এ লেখাগুলোর শৈলী অথবা লেখাগুলোর রচয়িতাই বা ছিলেন কারা, তা নিয়ে চিন্তা করিনি। তারা তাদের ঐশ্বর্য রেখেছিল আমার সামনে এবং সেগুলোকে আমি গ্রহণ করেছিলাম, ঠিক যেভাবে আমরা গ্রহণ করি সূর্যকিরণ আর আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের

www.amarboi.org

ভালোবাসা। আমি ভালোবেসেছিলাম 'লিটল উমেন' কারণ এটা আমাকে চোখে দেখতে পাওয়া ও কানে শুনতে পাওয়া ছেলেমেয়েদের সাথে একটা আত্মীয়তার বোধ তৈরি করে দিয়েছিল। আমার জীবন সীমাবদ্ধ ছিল নানা দিক থেকে, তাই আমাকে বই-এর দুই মলাটের মাঝেই সেই জগতের খবর পেতে দেখতে হতো, যা ছিল আমার বোধের জগতের বাইরে।

'দ্য পিল্‌গ্রিম্‌স প্রোগেস্' বিশেষ যত্ন নিয়ে পড়িনি আমি এবং মনে হয় আমি ওটা পড়ে শেষও করিনি আর। 'ফেব্‌ল্‌স্' পড়ায়ও ছিল না মনোযোগ। আমি প্রথমে লা ফন্টেইনের 'ফেব্‌ল্‌স্'-এর ইংরেজি অনুবাদ পড়েছিলাম এবং সেটা পড়েছিলাম খানিকটা কম উৎসাহ নিয়েই। পরে আমি বইটা আবার মূল ফরাসি ভাষায়ও পড়েছিলাম এবং আমি দেখেছিলাম যে প্রাণবন্ত চিত্রকল্প থাকা সত্ত্বেও এবং ভাষা ব্যবহারের যথেষ্ট মুনশিয়ানা থাকলেও বইটা আগের থেকে বেশি ভালো লাগেনি আমার। আমি জানি না, এরকম হওয়র কারণ কী? কিন্তু এটা ঠিক, যেসব গল্পে জীবজন্তুদের মানুষের মতো কথা বলানো হয় এবং কাজও করানো হয় সেগুলো মোটেই আমার অন্তরে গভীরভাবে স্পর্শ করে না। জন্তু-জানোয়ারদের উদ্ভট হাস্যকর আচরণ আমার মন আচ্ছন্ন করে রাখে ফলে গল্পে নিহিত নীতিকথাটার বিষয়ে একেবারেই খেয়াল থাকে না আমার।

তারপর আবার লা ফন্টেইন যদি আমাদের গভীরতম নৈতিকতা বোধকে আকর্ষণ করেও থাকেন, তবে তা করেছেন খুব কম ক্ষেত্রেই। আমাদের হৃদয়ের যে সূক্ষ্ম তন্ত্রীদের তিনি আঘাত করেন, তা উদ্দীপ্ত করে আমাদের যুক্তিবোধ আর আত্মপ্রীতিকে। তাঁর সমস্ত নীতিকাহিনীর মধ্যে এই ভাবনাটি প্রবহমান রয়েছে যে মানুষের নীতিবোধের উৎপত্তি হয় সম্পূর্ণভাবেই তার আত্মপ্রীতি থেকে এবং সেই আত্মপ্রীতি যদি পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয় যুক্তির দ্বারা, তবে জীবনে সুখ আসতে বাধ্য। তখন, যতদূর আমি বিচার-বিবেচনা করি, তাতে মনে হয়, আত্মপ্রীতিই বা স্বার্থপরতাই সব নষ্টের মূল; অবশ্য, আমার ভুলও হতে পারে। কেননা লা ফন্টেইনের অনেক বেশি মনুষ্যচরিত্র পর্যবেক্ষণের সুযোগ ছিল যা কোনোদিন আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আমি নিন্দাপূর্ণ এবং বিদ্রূপপূর্ণ কোনো নীতিগল্পের ব্যাপারে তত আপত্তি করি না, যত আপত্তি করি সেই সমস্ত গল্পের ব্যাপারে, যেখানে অতিগুরুত্বপূর্ণ সত্য শিক্ষা দেয় বাঁদর আর শেয়ালেরা।

কিন্তু আমি ভালোবাসি 'জাংগ্‌ল্ বুক' এবং 'ওয়াইল্ড্ অ্যানিম্যাল্‌স আই হ্যাভ্ নোন্' বই দুটি। আমি জীবজন্তুদের সম্পর্কে আন্তরিক আকর্ষণ অনুভব করি কারণ তারা বাস্তব প্রাণী এবং মানুষের হাস্য উদ্রেককর অতিরঞ্জিত অনুকরণ নয়। মানুষ সহানুভূতি প্রকাশ করে তাদের ভালোবাসা আর বেদনার প্রতি, হাসে তাদের কৌতুককর আচরণে আর কাঁদে তাদের দুঃখদায়ক ঘটনায় এবং যদি তারা নির্দেশ করে কোনো নীতিবোধের প্রতি, তবে তা এত সূক্ষ্মভাবে থাকে যে আমরা সে বিষয়ে সচেতন হই না একেবারেই।

www.amarboi.org

আমার মন স্বাভাবিকভাবে এবং সানন্দে নিজেকে মেলে ধরত কোনো প্রাচীন ধারণাকে গ্রহণ করার জন্য। গ্রিস, আসলে প্রাচীন গ্রিস আমার ওপর প্রয়োগ করেছিল এক রহস্যময় মুগ্ধতার আবরণ। আমার কল্পনায় ঐসব পৌত্তলিক দেবদেবীরা এখনও ঘুরে বেড়ান পৃথিবীর বুকে, মুখোমুখি কথা বলেন মানুষের সাথে এবং আমার হৃদয়ে আমি গোপনে মন্দির গড়েছিলাম তাঁদের জন্য, যাঁদের আমি ভালোবাসতাম সব থেকে বেশি। আমি জানতাম এবং ভালোবাসতাম সব পরীদেরই এবং সব বীরদের আর উপদেবতাদেরও— না, ঠিক সবাইকে নয়, কেননা মেডিয়া এবং জেসনদের নিষ্ঠুরতা এবং লোভ ছিল এত দানবীয় যে তা ছিল ক্ষমার অযোগ্য, আমি ভেবে অবাক হতাম, দেবতারা কেন তাদের সুযোগ দিতেন অন্যায় করার এবং শাস্তি দিতেন পরে শয়তানির জন্যই। এবং ঐ রহস্য রয়েছে আজও সমাধান না হয়ে। আমি প্রায়ই আশ্চর্য হই কীভাবে—

'ঈশ্বর পারেন থাকতে চুপ করে
যখন পাপীরা দেঁতো হাসি হেসে গুড়ি মেরে ঢুকে পড়ে তাঁর সময়ের ঘরে!'

ইলিয়াডই সেই বই যা গ্রিসকে আমার কাছে স্বর্গতুল্য করেছে। আমি পরিচিত ছিলাম ট্রয়নগরীর সাথে মূল গ্রন্থ পড়ার আগেই এবং তাই গ্রিক ভাষার ব্যাকরণের সীমা অতিক্রম করার পরই গ্রিক শব্দগুলো তাদের মাধুর্য মেলে ধরল আমার সামনে, মহৎ কাব্যকৃতি তা ইংরেজি বা গ্রিক যে ভাষাতেই লেখা থাকুক না কেন, তা বোঝার জন্য কোনো দোভাষীর দরকার হয় না, দরকার হয় শুধু সংবেদনশীল হৃদয়ের। বহু মানুষ, যাঁরা কবিদের মহৎ সৃষ্টিগুলোকে বিশ্লেষণ ও পরিশ্রমী মন্তব্য দিয়ে করে তোলেন অদ্ভুত— এই সরল সত্যটা তাঁরা যদি জানতেন! একটা সুন্দর কবিতা উপলব্ধি করার এবং তার রসগ্রহণের জন্য কবিতাটির প্রতিটি শব্দের সংজ্ঞা দেওয়া, বাক্যের মধ্যে তার প্রধান কাজ নির্ধারণ করা এবং বাক্যে তার ব্যাকরণগত অবস্থানই বা কি তা জানার প্রয়োজন হয় না। আমি জানি আমার বিজ্ঞ অধ্যাপকেরা ইলিয়ডে অনেক বেশি সম্পদ খুঁজে পেয়েছেন যা আমি কোনো দিনই খুঁজে পাব না, তাতে কী! আমি তো অর্থলোভী নই। অন্যরা আমার থেকে জ্ঞানী, এই ভাবনায় আমার অসন্তোষ নেই। কিন্তু তাঁরা তাঁদের বিশাল জ্ঞান নিয়েও ঐ অপূর্ব মহাকাব্য পাঠে যে আনন্দ উপভোগ করা যায় তা পরিমাপ করতে পারেন না আমার মতোই। যখন আমি ইলিয়ডের সুন্দরতম স্তবকগুলো পড়ি, তখন আমি সচেতন হই এক আত্মার উপলব্ধিতে যা আমাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে জীবনের এক সংকীর্ণ এবং যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতি থেকে। আমি আমার দেহের সীমাবদ্ধতার কথা ভুলে যাই— আমার জগৎ উঠে আসে ওপরে, সেই স্বর্গের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, জাঁকজমক, আসলে সবই আমার, একান্তই আমার!

ঈনিড সম্পর্কে আমার খুব বেশি মুগ্ধতা নেই, কিন্তু যেটুকু আছে তা কম আন্তরিক নয়। এটা আমি পড়েছিলাম যতটা সম্ভব টীকা অথবা অভিধানের সাহায্য

www.amarboi.org

ছাড়াই এবং আমি সবসময়ই অনুবাদ করতে পছন্দ করতাম সেই অংশগুলোই, যেগুলো আমার ভালো লাগতো বিশেষভাবে। ভার্জিলের চিত্রময় বর্ণনা সুন্দর কখনও কখনও। কিন্তু তাঁর কাব্যের দেবতা আর মানুষেরা ঘুরে বেড়ায় আবেগের অনুভূতি-দ্বন্দ্ব, করুণা, আর ভালোবাসা নিয়ে। মনে হয় তারা যেন এলিজাবেথীয় যুগের মুখোশ পরা এক একটি মনোরম চরিত্র, অন্যদিকে ইলিয়ডের চরিত্ররা চলে গান গেয়ে, লাফিয়ে লাফিয়ে। চন্দ্রলোকে উদ্ভাসিত অ্যাপলো-এর মর্মরমূর্তির মতোই শান্ত ও মোহময় ভার্জিলের রচনা; আর হোমারের রচনা যেন সূর্যলোকে উদ্ভাসিত প্রাণোচ্ছল এক যুবক, যার কেশরাশি ওড়ে বাতাসে।

কী সহজই না ওড়া ভর করে কাগজের ডানায়। 'গ্রিক হিরোজ' থেকে ইলিয়ড না ছিল খুব কম দিনের যাত্রা, না ছিল সে যাত্রা সুখকর। একজন মানুষ পৃথিবী পরিক্রমা করে আসতে পারে বহুবার, সেই সময়ের সীমায়, যে সময় ধরে আমি মন্থর গতিতে, ক্লান্ত পায়ে ব্যাকরণ আর অভিধানের গোলক ধাঁধায় ঘুরেছি অথবা পড়ে গিয়েছি ভীতিপ্রদ সেই সব গর্তে যাদের বলা হয় 'পরীক্ষা' যেগুলোর আয়োজন করে বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়গুলো বিভ্রান্ত করতে তাদের, যারা খোঁজে ও ছোটে জ্ঞানের পিছে পিছে। আমার মনে হয়, এই ধরনের পিলগ্রিম্‌স প্রোগ্রেস্ অর্থাৎ তীর্থযাত্রীদের স্থান থেকে স্থানান্তরে গমন-এর মতো পড়াশোনা প্রাপ্তির কথা চিন্তা করলে তা যথাযথই ছিল বলা যেতে পারে। কিন্তু এটা আমার কাছে অশেষ বলে মনে হয়েছে, যদিও মাঝে মাঝেই সেই রাস্তারই কোনো বাঁকে আনন্দময় আর অপ্রত্যাশিত ঘটনাও ধরা পড়েছে আমার কাছে। পড়ে কিছু বোঝার ক্ষমতা হওয়ার আগেই আমি বাইবেল পড়তে আরম্ভ করেছিলাম। এখন ভাবলে অদ্ভুত মনে হয় এমন একটা সময় ছিল, যখন বিস্ময়কর সুরগুলো শোনায় আমার অন্তরাত্মা ছিল বধির, কিন্তু আমি বেশ মনে করতে পারি একটা বৃষ্টিমুখর রবিবারের সকালের কথা যখন আমার কোনো কিছু করার না থাকায় আমি আমার এক সম্পর্কিত বোনকে বাইবেল থেকে একটা গল্প পড়ে শোনাতে অনুরোধ করেছিলাম। যদিও সে ভাবতে পারেনি, আমি বাইবেলের গল্প বুঝতে পারব, সে আমার হাতে বানান করে 'জোসেফ এবং তার ভাইরা' গল্পটি লিখেছিল। যেকোনো কারণেই হোক, গল্পটা আমাকে আকর্ষণ করতে পারেনি। এর অদ্ভুত ভাষা এবং পুনরুক্তিতে গল্পটাকে মনে হয়েছে অবাস্তব এবং এর ঘটনা ঘটেছিল বহুদূরে ক্যানন দেশে এবং আমি ঘুমিয়ে পড়লাম আর স্বপ্নে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ালাম ঘুমের দেশেই– জোসেফের ভাইয়েরা নানা রঙের পোশাকে জেকবের তাঁবুতে এসে অশোভন মিথ্যা বলার আগেই। আমি বুঝতে পারি না কেন গ্রিকদের গল্পগুলো এত মনোহারিত্বে পূর্ণ বলে মনে হয় আমার কাছে এবং বাইবেলের গল্পগুলো আকর্ষণশূন্য মনে হয়, বস্টনে অনেক গ্রিস দেশের মানুষের সাথে আমার আলাপ হয়েছিল, আমি তাদের দেশের কাহিনী সম্বন্ধে তাদের উদ্দীপনা দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম, এমন হতে পারে, এই কারণেই বাইবেলের গল্প আমার ভালো

www.amarboi.org

লাগেনি। অন্যদিকে আমি দেখা পাইনি কোনো ইহুদি অথবা মিশরবাসীর এবং সেইজন্য এই সিদ্ধান্তে এসেছিলাম যে, তারা বর্বরের চেয়ে বেশি কিছু নয় এবং তাদের নিয়ে লেখা গল্পগুলো সবই কাল্পনিক, যে ধারণা ব্যাখ্যা করে কেন তাদের লেখায় রয়েছে পুনরাবৃত্তি, উদ্ভট সব নামসমূহ। আর আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো আমার কিন্তু গ্রিকদের পৈতৃক পদবিগুলোকে উদ্ভট বলার কথা মনে হয়নি।

কিন্তু কীভাবে আমি প্রকাশ করব সেই চমৎকারিত্ব যা আমি বাইবেলে খুঁজে পেয়েছিলাম পরবর্তীকালে। আমি বহুবছর ধরে একটা ক্রমবর্ধমান আনন্দ ও প্রেরণা নিয়ে পড়েছি বাইবেল; এবং এই গ্রন্থটিকে আমি যত ভালোবাসি অন্য কোনো গ্রন্থকে তত ভালোবাসি না। তবুও বাইবেলের মধ্যে এমন অনেক কিছু রয়েছে যার বিরুদ্ধে আমার সমগ্র সত্তা বিদ্রোহ করে এবং সেটা এতটাই তীব্র যে প্রয়োজনে বা বাধ্যবাধকতায় আমাকে এই গ্রন্থ প্রথম থেকে শেষ অবধি পড়তে হয়েছে তার জন্য আমি দুঃখিত। আমি মনে করি না, যে জ্ঞান আমি এই বই-এর ইতিহাস এবং উৎস সম্পর্কে লাভ করেছি, তা এই বই-এর মধ্যে অন্য যেসব অস্বস্তিকর বিবরণ আছে এবং যা আমি জানতে বাধ্য হয়েছি তার পরিপূরক। আমার তরফ থেকে আমি মি. হাওয়েলসের সাথে একমত যে, প্রাচীন সাহিত্যকে সব কদর্য ও বর্বরোচিত বিষয় থেকে মুক্ত করা দরকার। যদিও এই মহৎ গ্রন্থটিকে কোনোভাবে দুর্বল বা মিথ্যা বলে প্রমাণ করার বিষয়ে আমি অন্য সকলের মতোই আপত্তি জানাব।

এস্থার-এর বই-এর মধ্যে আছে কিছু জিনিস যা চিত্তাকর্ষক, ভীতিপ্রদ এবং সারল্যে ভরা। আর আছে ভয়ঙ্কর স্পষ্টবাদিতাও। এর থেকে বেশি নাটকীয় আর কী হতে পারে, যেখানে দেখা যায় এস্থার দাঁড়িয়ে রয়েছে তার দুষ্ট প্রভুর সামনে? সে জানত তার জীবন তার প্রভুর হাতে; তার প্রভুর ভয়ঙ্কর ক্রোধ থেকে তাকে রক্ষা করার মতো কেউ নেই। তবুও সে তার নারীসুলভ ভয়কে জয় করে প্রভুর মুখোমুখি হলো মহৎ দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং মনে একটিমাত্র চিন্তা নিয়ে, যদি আমি ধ্বংস হই, তবে আমি একাই মরব; কিন্তু আমি যদি বাঁচি, তা হলে আমার সমস্ত দেশবাসী বাঁচবে।

রুথের কাহিনীও কী আশ্চর্যরকম প্রাচ্য বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ! তবুও পারস্যের রাজধানীর নাগরিকদের জীবন থেকে কত আলাদা এই সরল গ্রামবাসীদের জীবন। রুথ এত অনুগত এবং শান্ত স্বভাবের যে, আমরা তাকে ভালো না বেসে থাকতে পারি না, যখন তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি শস্যকর্তনকারীদের সাথে ঢেউ খেলানোর শস্যক্ষেতের মাঝে। তার মনোরম এবং নিঃস্বার্থ সত্তা দীপ্তি দেয় এক উজ্জ্বল তারার মতো, অন্ধকার আর নিষ্ঠুর সময়ের আকাশে। রুথের ভালোবাসার মতো ভালোবাসাই পারে পরস্পর সংঘর্ষশীল ধর্মবিশ্বাস, আর গভীরে গাথা জাতিগত সংস্কারের উর্ধ্বে উঠতে, আর সমগ্র বিশ্বেই এমন ভালোবাসা খুঁজে পাওয়া কঠিন।

বাইবেল আমাকে দেয় এক সুগভীর সান্ত্বনার অনুভূতি, যা হলো–, 'দৃশ্যমান সব বস্তুই নশ্বর, আর যা কিছু অদৃশ্য তাই শাশ্বত।'

www.amarboi.org

আমি এমন কোনো সময়ের কথা মনে করতে পারি না যখন থেকে আমি বইকে ভালোবাসতে পেরেছি কিন্তু ভালোবাসিনি শেক্সপিয়রকে। আমি ঠিক বলতে পারবো না, কখন আমি ল্যাম্-এর 'টেলস্ ফ্রম শেক্সপিয়র' পড়তে শুরু করেছিলাম, কিন্তু এটা জানি যে আমি সেগুলো পড়েছিলাম শিশুর বোধ নিয়ে আর তার বিস্ময়বোধ নিয়েও। 'ম্যাকবেথ'ই মনে হয় আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছিল। গল্পের প্রতিটা ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ ছাপ চিরস্থায়ীভাবে আমার স্মৃতিতে মুদ্রিত করে রাখার জন্য বইটা মাত্র একবার পড়াই যথেষ্ট ছিল। বহুকাল সেই নাটকের প্রেতাত্মারা আর ডাইনিরা তাড়া করে ফিরছিল আমাকে, এমনকি স্বপ্নরাজ্যেও। আমি দেখতে পেতাম, নিশ্চিতভাবেই দেখতে পেতাম ছোরাটা আর লেডি ম্যাকবেথের ছোট ফর্সা হাত– সেই ভয়ঙ্কর কলঙ্কের দাগ আর শোকাহত রানীকে একইরকম বাস্তব বলে মনে হতো।

আমি 'কিং লিয়ার' পড়েছিলাম 'ম্যাকবেথ' পড়ার অল্প কিছুদিন পরেই এবং আমি কখনই ভুলব না সেই বিভীষিকার অনুভূতি যখন আমি সেই দৃশ্যটায় এসেছিলাম, যে দৃশ্যে গ্লস্টারের চোখ দুটি উপড়ে নেওয়া হয়েছিল। ক্রোধ আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, আমার আঙুলগুলো আর এগোতে রাজি হচ্ছিল না, আমি অনমনীয়ভাবে বসেছিলাম একটা দীর্ঘ সময় ধরে, আমার কপালের দুটো পাশ অর্থাৎ শিরা দপ দপ করছিল এবং সেই সাথে একজন শিশুর পক্ষে যতটা ঘৃণা অনুভব করা সম্ভব তা পুঞ্জীভূত হয়েছিল আমার অন্তরে।

শাইলক আর শয়তান-এর সাথে আমার পরিচয় ঘটেছিল প্রায় একই সময়, কারণ চরিত্র দুটি অনেক কাল জড়িয়ে ছিল আমার মনে। আমার মনে আছে, আমি তাদের জন্য দুঃখ বোধ করতাম। আমি অস্পষ্টভাবে অনুভব করতাম, এরা ভালো হতে চাইলেও ভালো হতে পারতো না, কারণ মনে হতো না যে কেউ তাদের কোনো সাহায্য করতে অথবা ন্যায়সঙ্গত কোনো সুযোগ দিতে পারত না। এমনকি এখনও আমি আমার মনে তাদের পুরোপুরি ধিক্কার দেওয়ার মতো কারণ খুঁজে পাই না। এমন অনেক সময় আসে যখন আমি অনুভব করি যে শাইলকরা, জুড়াসরা এমনকি শয়তানও ভালোত্বের ভাঙা চাকার এক একটা শিক, যা যথাসময়ে পাবে পরিপূর্ণতা।

এটা ভাবতে অবাক লাগে যে, প্রথমবার শেক্সপিয়রের রচনা পড়ার পর কীভাবে আমার মনে থেকে গেছে এত অপ্রীতিকর স্মৃতিরা। উজ্জ্বল, নম্র এবং অবাস্তব নাটকগুলো– যার মধ্যে যেটাকে এখন সবচেয়ে ভালো লাগে মনে হয় প্রথমে আমাকে মুগ্ধ করতে পারেনি, সম্ভবত এই কারণে যে সেগুলো প্রতিবিম্বিত করেছিল শিশুর জীবনের স্বাভাবিক উজ্জ্বল, উচ্ছল ও আনন্দময়তাকে। কিন্তু শিশুর স্মৃতির চেয়ে বেশি খামখেয়ালি হতে পারে না আর কিছুই : সে কী ধরে রাখবে তার স্মৃতিতে আর খেই বা হারিয়ে ফেলবে বিস্মৃতিতে, কেউ জানে না তা।

আজ পর্যন্ত আমি শেক্সপিয়র-এর নাটকগুলো বহুবার পড়েছি এবং সেগুলোর অংশবিশেষ আমি মুখস্থও করে ফেলেছি, কিন্তু আমি বলতে পারব না এর মধ্যে

www.amarboi.org

কোনটা আমি সব থেকে বেশি পছন্দ করি। ওগুলো পড়ায় আমার আনন্দ বৈচিত্রে পূর্ণ আমার মনের বৈচিত্র্যের মতোই। ছোট ছোট গান আর সনেটগুলো আমার কাছে অর্থবহ, সতেজ এবং বিস্ময়কর সুন্দর নাটকগুলোর মতোই। কিন্তু শেক্সপিয়র-এর প্রতি আমার ভালোবাসা সত্ত্বেও সমালোচক এবং ভাষ্যকারেরা তাঁর রচনার প্রতি পঙক্তিতে যে গভীর অর্থ খুঁজে পেয়েছেন সেগুলো সব পড়া আমার কাছে ক্লান্তিকর মনে হয়েছে। আমি তাঁদের ভাষ্য মনে রাখার চেষ্টা করতাম কিন্তু সেগুলো আমাকে করেছিল নিরুৎসাহিত এবং বিরক্তও। তাই আমি নিজের সাথে একটা গোপন বোঝাপড়া করে নিয়েছিলাম যে ওগুলো পড়ার আর চেষ্টাই করব না। এই চুক্তি আমি অল্প কিছুকাল হলো অধ্যাপক কিট্রেজের কাছে শেক্সপিয়র পড়ার সময় ভঙ্গ করেছি। আমি জানি যে, শেক্সপিয়র-এর সৃষ্টিতে এবং এই পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিস আছে যা আমি বুঝি না এবং আমি দেখে আনন্দিত হচ্ছি যে, একটার পর একটা অবগুণ্ঠন ক্রমশ উঠে যাচ্ছে আর প্রকাশ করছে চিন্তা আর সৌন্দর্যের নতুন জগৎ।

কবিতার পরেই যা আমার ভালো লাগে তা হলো ইতিহাস। যেগুলো আমি হাতে পেয়েছি সেই প্রত্যেকটি ঐতিহাসিকের বই-ই পড়েছি। পুস্তক তালিকার শুষ্ক ঘটনাসমূহ, ততোধিক শুষ্ক সন, তারিখের তালিকা থেকে শুরু করে গ্রীনের নিরপেক্ষ, চিত্রময় 'হিস্ট্রি অব দ্য ইংলিশ পিপল্', আর ফ্রি ম্যান-এর 'হিস্ট্রি অব ইউরোপ' থেকে এমারটনের 'মিডিল এজেস্'– সবই পড়েছিলাম। যে বই সর্বপ্রথম আমাকে ইতিহাসের মূল্য সম্পর্কে ধারণা দিয়েছিল তা ছিল সুইনটনের 'ওয়ার্লডস্ হিস্ট্রি' যেটা আমি উপহার পেয়েছিলাম আমার ত্রয়োদশ জন্মদিনে। যদিও আমি বিশ্বাস করি এই বইটা আর অকাট্য বলে গণ্য হয় না, তবু আমি বইটাকে আমার সম্পদগুলোর মধ্যে একটা মনে করে রেখে দিয়েছি। ওই ইতিহাস বইটা থেকেই আমি জানতে পেরেছি কীভাবে বিভিন্ন জাতির মানুষেরা ছড়িয়ে পড়েছিল দেশ থেকে দেশান্তরে এবং তৈরি করেছিল বড় বড় নগর। কেমন করে মাত্র কয়েকজন শাসক যাঁরা ছিলেন অমিত শক্তিমান মানব সবকিছুকে তাঁদের পদাবনত করেছিলেন এবং যাঁদের একটিমাত্র আদেশ লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে খুলে দিত সুখ-সমৃদ্ধির দ্বার। তেমনি আবার লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল সুখ-সমৃদ্ধির দ্বার : কীভাবে বিভিন্ন জাতি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল কারুশিল্পে আর জ্ঞানে আর আগামী যুগের জন্য প্রস্তুত করেছিল আরও বিপুল সমৃদ্ধির ক্ষেত্র এবং উত্তরের মহান সন্তানরা আবার জেগে উঠেছিল ফিনিক্স পাখির মতো। এবং কীভাবে স্বাধীনতা, সহনশীলতা এবং শিক্ষার দ্বারা সেই মহান এবং জ্ঞানী ব্যক্তিরা উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন সমগ্র বিশ্বের মুক্তির পথ।

আমার কলেজের পড়াশোনার মধ্যেই আমি কিছুটা পরিচিত হয়েছিলাম ফরাসি এবং জার্মান সাহিত্যের সাথে। একজন জার্মান সৌন্দর্যের আগে শক্তিকে, প্রচলিত বিশ্বাসের আগে সত্যকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে জীবন এবং সাহিত্য উভয় ক্ষেত্রেই।

www.amarboi.org

সে যা কিছু করে তার মধ্যে থাকে 'স্লেজ্-হাতুড়ি'র মতো একটা প্রচণ্ডতা, একটা শক্তির প্রকাশ। সে যখন কথা বলে তখন তা বলে অপরকে মুগ্ধ করতে নয়, সে কথা বলে এই কারণে যে, তা না করলে তার চিন্তাগুলো যা তার অন্তরাত্মাকে দগ্ধ করছে তাদের বেরোনোর পথ করে দিতে। নাহলে বিদীর্ণ হবে তার হৃদয়।

তাছাড়া জার্মান সাহিত্যে একটা সুন্দর সংযমের ব্যাপার আছে, যা আমি পছন্দ করি; কিন্তু এর প্রধান গৌরব হচ্ছে নারীর আত্মবিসর্জনকারী ভালোবাসার শক্তির স্বীকৃতি। এই ভাবনা ছড়িয়ে রয়েছে সমগ্র জার্মান সাহিত্যে এবং এই রহস্যময় চিন্তাই প্রকাশ পেয়েছে গ্যেটের 'ফাউস্ট'-এ :

'সব কিছুই ক্ষণস্থায়ী
পাঠানো প্রতীকদের মতো।
পৃথিবীর অপর্যাপ্ততা—
জন্ম দেয় ঘটনার।
অবর্ণনীয় সব
বর্ণিত হয় এইখানে।
নারীর অন্তরাত্মা পথ দেখায় আমাদের
উচ্চাকাশে, আরো উপরে!'

যে-সমস্ত ফরাসি সাহিত্যিকের লেখা আমি পড়েছি, তাদের মধ্যে মলিয়ের এবং রাসিন-এর লেখা সবচেয়ে ভালোলাগে। বালজাক-এর রচনায় এবং মেরিমী-এর লেখায় এমন কিছু সুন্দর অনুচ্ছেদ আছে, যা পাঠককে এক ঝলক সমুদ্রের ঠাণ্ডা বাতাসের মতো অনুভব দেয়। আলফ্রে দ্য মুসে এক অনন্য স্রষ্টা! আমি প্রশংসা করি ভিক্টর হুগোকে— আমি তাঁর প্রতিভার প্রশংসা করি, প্রশংসা করি তাঁর বুদ্ধিদীপ্তিরও, যদিও আমার প্রিয় সাহিত্যিকদের মধ্যে কেউ নন তিনি তবুও প্রশংসা করি তাঁর রোমান্টিকতারও। কিন্তু হুগো আর গ্যেটে এবং শিলার আর অন্য সব মহান দেশের মহৎ কবিরাই শাশ্বত বস্তুর ভাষ্যকার এবং আমার অন্তরাত্মা আনত মস্তকে আর পরম শ্রদ্ধায় অনুসরণ করে সেই মহাজীবনদের সেই লোকে— যেখানে সৌন্দর্য, সত্য আর মহত্ত্ব এক এবং অভিন্ন।

আমার আশঙ্কা হচ্ছে, আমার বই-এ আমি বই-বন্ধুদের সম্পর্কে খুব বেশি লিখে ফেলেছি; কিন্তু তবুও আমি সেই সব লেখকদের উল্লেখ করেছি যাঁদের আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি। এই ঘটনা থেকে অনেকে সহজেই মনে করতে পারেন যে আমার বন্ধুত্বের গণ্ডি খুবই সীমিত এবং অগণতান্ত্রিকও বটে, তবে এইরকম ধারণা করলে সেটা হবে খুবই ভুল। আমি বহু লেখককে পছন্দ করি বিভিন্ন কারণে— কার্লাইলকে পছন্দ করি অনমনীয় মনোভাবের জন্য এবং কপটতার প্রতি ঘৃণার জন্য। আমি ভালোবাসি ওয়ার্ডসওয়ার্থকে, যিনি মানুষ আর প্রকৃতির একাত্মতার সম্পর্ক সম্বন্ধে শিখিয়েছেন; আমি হুডের লেখায় পাই খাপছাড়া বিষয় এবং তাঁকে ভালোবাসি বিস্ময়গুলোর কারণে। হেরিককে ভালোলাগে কবিতায় অদ্ভুত অথচ মনোরম লিলি

www.amarboi.org

আর গোলাপের সুগন্ধ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। আর হুইটিয়ারকে পছন্দ করি তাঁর উদ্দীপনা আর ন্যায়পরায়ণতা বা নৈতিক সততার জন্য। আমি তাঁকে চিনতাম ব্যক্তিগতভাবে, আর আমাদের বন্ধুত্বের কথা মনে করলে আনন্দ হয়ে যায় দ্বিগুণ। আমি মার্ক টোয়েনকে ভালোবাসি– কে না ভালোবাসে তাঁকে? দেবতারাও তাঁকে ভালোবাসতেন এবং তাঁর অন্তরে ভরে দিয়েছিলেন সব ধরনের প্রজ্ঞা; অবশেষে তিনি নৈরাশ্যবাদী হয়ে যেতে পারেন এই ভয়ে দেবতারা তাঁর হৃদয়কে ভালোবাসা আর বিশ্বাসের রামধনু দিয়ে রাঙিয়ে দিয়েছিলেন। আমি স্কটকে পছন্দ করি তাঁর সজীবতা, উদ্যম আর বিশাল সততার জন্য। আমি সেইসব লেখকদের ভালোবাসি যাঁদের মন লাওয়েল-এর মতো টগবগ করে ওঠে আশাবাদের সূর্যকিরণে, যাঁদের মন ভরে থাকে আনন্দের ঝরনা আর শুভেচ্ছায়, যাঁদের মধ্যে থাকে সাময়িক ক্রোধের ঝলক এবং এখানে ওখানে নিরাময়কর বারিসিঞ্চন, সহানুভূতি আর করুণা।

এককথায় সাহিত্য আমার কল্পলোক। এখানে আমাকে কেউ নাগরিকত্ব থেকে চ্যুত করতে পারবে না। কোনো বোধের বাধাই আমার বই-বন্ধুদের সাথে মধুর এবং সহৃদয় রচনাগুলো থেকে আমাকে বিরত করতে পারে না। তারা আমার সাথে কথা বলে অস্বস্থি ছাড়াই। যা কিছু আমি শিখেছি অথবা যা কিছু আমাকে শেখানো হয়েছে, তা সবই অনন্ত ভালোবাসা আর স্বর্গীয় দানে'র তুলনায় হাস্যকরভাবে তুচ্ছ আর গুরুত্বহীন।

www.amarboi.org

বাইশ

আগের অধ্যায়গুলো পড়ে পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, আমার আনন্দ বহুরূপী ও বহুবিচিত্র।

গল্পে বহুবার দেশের ও বাইরের খেলার প্রতি আমার ভালোবাসার কথা জানিয়েছি। যখন আমি একেবারেই শিশু, আমি নৌকা বাইতে ও সাঁতার কাটতে শিখেছি এবং গ্রীষ্মকালে আমি যখন রেন্‌থাম, ম্যাসাচুসেট্‌স-এ ছিলাম, প্রায় আমরা নৌকাতেই বাস করেছি। বন্ধুরা যখন আমার কাছে আসে, আমি তাদের নিয়ে নৌবিহারে বেরিয়ে যাই– এতে আমি যত আনন্দ পাই সেরকম আর কিছুতে পাই না। আমি অবশ্য নৌকাকে ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারি না। যদি কেউ একজন নৌকার পশ্চাদভাগে বসে হাল ধরে থাকে তখনই কেবল নৌকা চালাই। নদীর জলজ ঘাস, শালুক ফুল এবং তীরভূমির ঘ্রাণ নিতে নিতে নৌকা চালানো এক মজার খেলা। আমি চামড়ার হাতলের দাঁড় ব্যবহার করি, কারণ তাতে দাঁড়গুলো নৌকায় আটকে রাখতে সুবিধা হয় এবং জলের বাধাতে আমি জানতে পারি দাঁড়গুলো নৌকাকে সাম্যাবস্থায় রেখে ঝুলছে কিনা। স্রোতের বিপরীতে চলার সময়ও ঠিক একই অবস্থা থাকে। আমি তা বলতে পারি। আমি বাতাস ও ঢেউ-এর সাথে প্রতিযোগিতায় নামি। সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার হলো, ছোটো নৌকাটি আমার অনুগত এবং আমার ইচ্ছা ও শারীরিক শক্তির কাছে বাধ্য, উজ্জ্বল দোদুল্যমান তরঙ্গের ওপর হাল্কাভাবে এগিয়ে চলে এবং আমি জলের একগুঁয়ে দাম্বিক তরঙ্গভঙ্গকে অনুভব করি!

আমি ডোঙা বা শালতিতে যাওয়া উপভোগ করি এবং আমার মনে হয় আপনারা শুনে হাসবেন যে আমি বিশেষভাবে জ্যোৎস্না রাতে এই শালতি-ভ্রমণ পছন্দ করি। এটা সত্য যে, আমি পাইনগাছগুলোর পিছনে চাঁদ উঠতে এবং তাকে চুপি চুপি ধীরে আকাশপথে এগিয়ে যেতে ও আমাদের জন্যে একটা আলোকিত পথ করে দিতে দেখিনি; কিন্তু আমি জানি সে তার স্থানে আছে এবং আমি যখন নৌকায় রাখা বালিশের মধ্যে শুয়ে পড়ি ও জলে হাত রাখি, আমার মনে হয়, আমি তার চলাকালীন চকচকে পোশাক অনুভব করতে পারি। কখনও কখনও কোনো এক সাহসী ছোট মাছ আমার আঙুলের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং প্রায়ই কোনো জলপদ্ম আমার হাত সলজ্জভাবে ছুঁয়ে যায়। যখন আমরা কোনো সংকীর্ণ উপসাগরের খাঁড়ি থেকে বেরিয়ে আসি, হঠাৎ আমার চারপাশে বিস্তৃত বাতাসের উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠি। এক দীপ্তিমান উষ্ণতা যেন আমাকে জড়িয়ে ধরে। সেই উষ্ণতা সূর্যের তাপে উত্তপ্ত হওয়া গাছগুলো থেকে আসে, না জল থেকে আসে, আমি কখনই জানতে পারি না। এমনকি শহরের মধ্যস্থলেই আমার এই একই রকম অদ্ভুত অনুভূতি হয়। আমি এটা

www.amarboi.org

শীতল, ঝোড়ো দিনে এবং রাত্রে অনুভব করি। এটা যেন আমার মুখে উষ্ণ ঠোঁটের চুম্বনের মতো।

আমি খুব আনন্দ পাই নৌকা ভ্রমণে। ১৯০১-এর গ্রীষ্মকালে নোভা স্কটিয়ায় বেড়াতে গেলাম এবং মহাসাগরের সাথে পরিচিত হলাম ও উপভোগ করলাম, যেভাবে এর আগে আর কখন করিনি ইভান্‌জেলিন-এর দেশে, যে দেশ সম্বন্ধে লংফেলো সুন্দর মনোমুগ্ধকর কবিতা লিখেছেন। সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে মিস সুলিভান ও আমি হ্যালিফ্যাক্স গেলাম। এখানে আমরা গ্রীষ্মের বেশিটা সময় কাটালাম। বন্দরের পোতাশ্রয়টা ছিল আমাদের আনন্দ, আমাদের স্বর্গ। বেডফোর্ড অববাহিকা পর্যন্ত, ম্যাকন্যাব দ্বীপে, ইয়র্ক রিডাউটে ও উত্তর-পশ্চিম খাঁড়ি পথে আমরা কী গৌরবময় নৌকাবিহারই না করেছিলাম! এবং বিখ্যাত নিঃশব্দ মেন-অব-ওয়ার জেটির ছায়ায় আমরা কত আরামদায়ক আশ্চর্য সময় কাটিয়েছিলাম। এসবই কত মজার, কত সুন্দর ছিল। এদের স্মৃতি আমার কাছে এক চিরকালের আনন্দ হয়ে আছে।

একদিন আমার এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিম খাঁড়ি পথে একটা নৌকাদৌড় ছিল যেখানে বিভিন্ন যুদ্ধজাহাজ থেকে আনা নৌকাকে রাখা হয়েছিল। আমরা অনেকের সাথে একটা পালতোলা নৌকায় চড়ে সেই দৌড় দেখতে গিয়েছিলাম। শত শত পালতোলা নৌকা কাছাকাছি থেকে এদিক ওদিক দুলছিল। সমুদ্র ছিল শান্ত। যখন দৌড় শেষ হয়ে গেল ও আমরা ফেরার জন্য বাড়িমুখো হলাম, একজন লক্ষ করল একখণ্ড কালো মেঘ সমুদ্রের ওপর থেকে উঠে আসছে। এই মেঘ বেড়ে উঠল এবং ঘন হয়ে সারা আকাশ ছেয়ে ফেলল। বাতাস উঠল, অদৃশ্য বাধায় রাগে গোঙাতে লাগল। আমাদের ছোট্ট নৌকাটা নির্ভয়ে সেই ঝড়ের সম্মুখীন হলো; তার পাল বিস্তৃত হয়ে খুলে গেল ও দড়ি টানটান হয়ে থাকল এবং মনে হলো সে যেন বাতাসের ওপর বসে আছে। কখনও সে বিশাল তরঙ্গে পাক খেল, কখনও এক বিশাল ঢেউ-এর ওপর লাফিয়ে উঠল তার ক্রুদ্ধ গর্জন ও হিস হিস শব্দের দ্বারা চালিত হবে বলে। প্রধান পাল নিচে নেমে এলো। ওটাকে পেরেক ও দড়ি দিয়ে টেনে বেঁধে প্রতিরোধী বাতাসের সাথে লড়াই করতে লাগলাম আমরা, বাতাস প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ মত্ততায় আমাদের এপাশে ওপাশে ছিটকে দিতে লাগল। আমাদের হৃৎস্পন্দন দ্রুত চলতে লাগল এবং ভয়ে নয়, উত্তেজনায় আমাদের হাত কাঁপতে লাগল। কারণ আমাদের নরওয়ের সমুদ্র-দস্যুদের হৃদয় ছিল এবং আমরা জানতাম আমাদের যাত্রার পরিচালক এই পরিবেশে খুবই দক্ষ। সে অনেক ঝড়ের মধ্য দিয়ে দৃঢ় হাতে ও অভিজ্ঞ চোখে সমুদ্রাভিযান করেছে। একটা বিশাল নৌকা ও পোতাশ্রয়ের বন্দুকবাহী নৌকাগুলো আমাদের অভিবাদন জানাল এবং তার নাবিকরা আমাদের ছোট নৌকার চালককে উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করতে লাগল, কারণ সে এই ছোট্ট পালতোলা নৌকা নিয়ে ঝড়ের মধ্যে সমুদ্রে আসতে সাহস করেছে। অবশেষে শীতার্ত, ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত হয়ে আমরা আমাদের জেটিতে পৌঁছলাম।

www.amarboi.org

গত গ্রীষ্মে আমি নিউ ইংল্যান্ডের সবচেয়ে চমৎকার এক গ্রামের সবচেয়ে সুন্দর এক স্থানে কাটিয়েছিলাম। ম্যাসাচুসেট্সের রেনথাম আমার প্রায় সবরকম আনন্দ ও দুঃখের সাথে জড়িয়ে আছে। বহু বছর যাবৎ কিং ফিলিপ ঝিলের পাশে মি. জে. ই. চেম্বারলিন ও তাঁর পরিবারের বাড়ি রেড ফার্ম ছিল আমারও বাড়ি। আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সাথে এই বন্ধুদের করুণা ও তাঁদের সাথে কাটানো সুখী দিনগুলোকে স্মরণ করি। তাঁদের ছেলেমেয়েদের মিষ্টি সঙ্গ আমার জীবনে অনেকখানি জুড়ে ছিল। আমি তাদের সবরকম খেলায়, বনের মধ্যে আনন্দে ঘুরে বেড়ানোয় ও জলে হৈ-হল্লায় যোগ দিতাম। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বকবক করা, আমার বলা পরী-ভূত-বামনদের এবং এক বীর ও ধূর্ত ভালুকের গল্পে তাদের আনন্দ পাওয়া– মনে করতে আনন্দ পাই। মি. চেম্বারলিন আমাকে গাছ ও বুনোফুলের রহস্যের সাথে পরিচিত করিয়েছিলেন এবং আমি আমার ছোট্ট ভালোবাসার কান দিয়ে ওক গাছের ভিতরে রসের চলাচল শুনতাম এবং পাতায় পাতায় সূর্যের আলোর জ্বলে উঠা দেখতাম। এটা এরকমভাবে–

'যেভাবে গাছের শিকড়, যে মাটির অন্ধকারে চাপা থাকে, গাছের শিখরে আনন্দকে উপভোগ করে এবং সূর্যকিরণ ও বিস্তৃত বাতাস এবং পাখাযুক্ত জিনিসকে প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে অনুভব করে, সেভাবে আমি উপভোগ করি ও অনুভব করি।'

আমার কাছে অদৃষ্ট জিনিসের সাক্ষ্য এনে দেয়।

আমার মনে হয় পৃথিবীর আদিকাল থেকে মানবজাতির দ্বারা অনুভূত ধারণা ও আবেগগুলোকে বোঝার ক্ষমতা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আছে। প্রত্যেকটি ব্যক্তিসত্তার সবুজ পৃথিবী ও জলের কলকলধ্বনির স্মৃতি তার মগ্নচৈতন্যে থাকে। অতীত বংশপরম্পরা থেকে পাওয়া এই দানকে অন্ধত্ব বা বধিরতা কখনও হরণ করতে পারে না। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এই ক্ষমতা এক ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের বোধের মতো– এক আত্মিক বোধ যা বিভিন্নের মধ্যে এককে দেখে, শোনে ও অনুভব করে।

রেনথাম-এ আমার অনেক গাছবন্ধু আছে। এদের মধ্যে একজন হলো এক চমৎকার ওক গাছ, যা আমার হৃদয়ের এক বিশেষ গর্বের বিষয়। আমি আমার অন্য বন্ধুদের এই রাজকীয় গাছকে দেখাতে নিয়ে যাই। যেখান থেকে কিং ফিলিপ ঝিল দেখা যায় সেই সামনের খাড়া বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এটি। যাঁরা গাছবিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞানী তাঁরা বলেন এটা নিশ্চয়ই আটশত বা হাজার বছর ধরে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। প্রবাদ আছে, এই গাছের নিচে দাঁড়িয়ে রেড ইন্ডিয়ানদের বীর অধিপতি রাজা ফিলিপ শেষবারের মতো পৃথিবী ও আকাশের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন।

বিশাল ওক গাছটি থেকে অনেক বেশি নম্র, স্নিগ্ধ ও সুগম আমার আর এক গাছবন্ধু ছিল– তা হলো এক লিন্ডেন গাছ (পাতিলেবুর গাছ)। ওটা রেড ফার্ম-এর দ্বারপথের উঠোনে বেড়ে ওঠেছিল। এক বিকেলের ভয়ঙ্কর বজ্রবিদ্যুৎসহ এক ঝড়বৃষ্টিতে আমি বাড়ির পাশে প্রচণ্ড মড়মড় শব্দ অনুভব করলাম এবং কেউ বলার

www.amarboi.org

আগেই আমি বুঝলাম যে লিন্ডেন গাছটা পড়ে গেল। আমরা বাইরে এসে সেই গাছবীরকে দেখতে গেলাম যে অনেক ঝড় সহ্য করেছে। সেটাকে মাটিতে শুয়ে থাকতে দেখে আমার হৃদয় যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে উঠল– গাছটা না পড়ার জন্য কত কঠোর চেষ্টা করেছে এবং এখন মহান মর্যাদা নিয়ে পড়ে আছে।

কিন্তু এটা ভুলিনি যে আমি গত গ্রীষ্মকাল সম্বন্ধে লিখতে বসেছি। আমার পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেই মিস সুলিভান ও আমি সেই স্থানে তাড়াতাড়ি চলে গেলাম, যেখানে তিনটি হ্রদের একটির ওপর আমাদের একটা ছোট কুটির ছিল। এই তিনটি হ্রদের অবস্থানের জন্য রেনথাম বিখ্যাত। এখানের দীর্ঘ, রৌদ্রালোকিত দিনগুলো ছিল আমার এবং আমি কাজ ও কলেজের সব চিন্তা ও কোলাহলপূর্ণ শহর পিছনে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। রেনথাম-এ আমরা বাইরের ঘটনাগুলোর প্রতিধ্বনি পেতাম– তা ছিল যুদ্ধ, সন্ধি, সামাজিক সংঘাত সম্বন্ধীয়। আমরা দূর প্রশান্ত মহাসাগরের নিষ্ঠুর, অপ্রয়োজনীয় লড়াই সম্বন্ধে শুনেছিলাম এবং পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে চলতে থাকা দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে জেনেছিলাম। আমরা জেনেছিলাম আমাদের স্বর্গোদ্যানের সীমার বাইরে মানুষজন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ইতিহাস তৈরি করছে যাতে তারা অধিকতর ভালোভাবে ছুটি কাটাতে পারে। কিন্তু আমরা এইসব জিনিস খুব অল্পই লক্ষ করেছিলাম। এইসব জিনিস একদিন চলে যাবে; এখানে হ্রদ আছে, বন আছে, বিস্তৃত ডেইজি তারাফুলের বিস্তীর্ণ ক্ষেত আছে আর আছে মিষ্টি সুবাসিত প্রান্তর এবং এরা চিরকাল থাকবে।

যেসব মানুষ মনে করে সমস্ত সংবেদনা আমাদের কাছে আসে চোখ ও কানের মধ্য দিয়ে, তারা আশ্চর্য হয় এই ভেবে যে আমি ফুটপাথের অনুপস্থিতি অর্থাৎ শহরের রাস্তায় ও গ্রামের পথ দিয়ে চলার মধ্যে পার্থক্য ছাড়া আর কোনো পার্থক্য অনুভব করতে পারি কিনা। তারা ভুলে যায় যে আমার সমগ্র শরীরী সত্তা আমার চারপাশের অবস্থা সম্বন্ধে সজীব ও সচেতন থাকে। শহরের কোলাহল আমার স্নায়ুকে সজোরে আঘাত করে এবং আমি বহুসংখ্যক অদৃশ্য মানুষের অবিরাম পদদলন অনুভব করি এবং তার কর্কশ সুর আমার শক্তিকে ক্ষয় করে। পাকা রাস্তার ওপর ওয়াগনের ঘর্ষণশব্দ এবং মেশিনের ঝনঝন শব্দ স্নায়ুর পক্ষে আরো কষ্টকর হয় যদি না কারোর মনোযোগ শহরের পরিদৃশ্যের প্রতি আকর্ষিত হয়, যে দৃশ্য শহরের কোলাহলপূর্ণ রাস্তাতেও সর্বদা দেখা যায়, যারা অবশ্য সেই দৃশ্য দেখতে সমর্থ হয়।

গ্রাম অঞ্চলে প্রকৃতির সুন্দর দৃশ্যগুলো মানুষ দেখতে পায় এবং তার আত্মা জনাকীর্ণ শহরে বিদ্যমান অস্তিত্ব রক্ষার কঠিন সংগ্রামে বিষাদগ্রস্ত হয় না। আমি অনেক বার সংকীর্ণ, নোংরা রাস্তাগুলো দেখেছি যেখানে দরিদ্র মানুষেরা বাস করে। এবং আমি রাগান্বিত ও ক্ষুব্ধ হই এ কথা ভেবে যে ভালো লোকেরা সুন্দর সুন্দর বাড়িতে বাস করে এবং বলশালী ও সুন্দর হয়ে তৃপ্তিতে থাকে। অথচ অন্যেরা অর্থাৎ গরিব লোকেরা নোংরা অন্ধকার বস্তিগুলোতে বাস করে। কুৎসিত, শীর্ণ ও হীন জীবনযাপন করে। এইসব নোংরা গলিতে যেসব ছেলেমেয়েরা অর্ধ-উলঙ্গ ও অর্ধভুক্ত

www.amarboi.org

হয়ে বাস করে, তারা তোমার ঘুসি খাওয়ার ভয়ে তোমার প্রসারিত হাত থেকে দূরে থাকে। এইসব অপ্রিয় মানুষেরা আমাকে তাড়িত করে ও অবিরাম যন্ত্রণা দেয়। অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোক আছে যাদের শরীর কুঁচকে গেছে ও বেঁকে গেছে। আমি তাদের কঠিন, রুক্ষ হাতগুলো দেখি এবং উপলব্ধি করি তাদের জীবন কত অন্তহীন সংগ্রামে পূর্ণ– এ সংগ্রাম কিছু করার জন্য ব্যর্থ চেষ্টার লড়াই-এর বেশি কিছু না। তাদের জীবনে মনে হয় চেষ্টা ও সুযোগ লাভের মধ্যে প্রচুর ফাঁক আছে। আমরা বলি, সূর্যকিরণ ও বাতাস সকলের কাছে ঈশ্বরের অকৃপণ দান; কিন্তু তা কি সত্যি? ওই অদূরে নোংরা পল্লীতে সূর্যের কিরণ প্রবেশ করে না এবং সেখানকার বাতাস দুর্গন্ধময়। আহা, হে মানুষ, তুমি কীভাবে তোমার ভাইকে ভুলে যাও, তার জীবনে বাধার সৃষ্টি কর এবং ঈশ্বরের কাছে বল, 'আমাকে আজকের দিনের রুটি দাও', যখন ওই রকম এক মানুষের তা নেই! আহা, যদি এরকম হতো যে মানুষ শহরের চাকচিক্য, তার কোলাহল ও সম্পদ ছেড়ে বন ও প্রান্তরের সরল-সৎ জীবনে ফিরে যেত! তাহলে তাদের সন্তানেরা মহান গাছদের মতো মর্যাদা নিয়ে বাস করতে পারত এবং তাদের চিন্তাগুলো পথের পাশে জন্মানো ফুলের মতো সুন্দর ও পবিত্র হতো। যখন আমি বছর শেষে কাজ সেরে গ্রামাঞ্চলে ফিরি, তখন মনে হয় এমন ভাবা ও হওয়া বুঝি মোটেই অসম্ভব নয়।

কী আনন্দ যে আমি পাই যখন আমার পায়ের তলায় আবার পৃথিবীর নরম মাটির স্পর্শ অনুভব করি, ঘাসপথ দিয়ে যাই ও শ্যাওলাপূর্ণ ছোট নদীতে পৌঁছাই। সেখানে আমি সুরেলা তরঙ্গায়িত জলপ্রপাতের জলে আমার আঙুল ডোবাতে পারি, অথবা পাথুরে দেয়াল কষ্টে ডিঙিয়ে সবুজ প্রান্তরে যাই, যে প্রান্তর উন্মত্ত আনন্দে কখনও হুমড়ি খেয়ে পাক খায় ও উঁচুতে ওঠে!

অলসভাবে হাঁটার পাদুটোকে দ্বি-আসনবিশিষ্ট সাইকেলের পাক খাওয়া উপভোগ করি। মুখের ওপর ছুটে আসা বাতাসের স্পর্শ এবং আমার লৌহযানের লাফিয়ে লাফিয়ে চলা কত চমৎকার। বাতাসের মধ্য দিয়ে দ্রুত ছুটে যাওয়া আমার মনে এক সুন্দর শক্তি ও প্রফুল্লতার অনুভূতি এনে দেয় এবং আমার নাড়ি দ্রুত স্পন্দিত হয়। যেন নেচে ওঠে ও আমার হৃদয় গান গেয়ে ওঠে।

বেড়াতে যাওয়ার সময় যখনই সম্ভব হয় আমার কুকুর আমার সাথেই থাকে। ঘোড়ায় চড়ার সময় আর নৌকা ভ্রমণের সময়ও। আমার অনেক কুকুর বন্ধু ছিল– বিশালকায় ম্যাস্টিফ্, শান্ত চোখওয়ালা 'স্পানিয়েল', বনসম্পর্কে অভিজ্ঞ সেটার এবং সৎ, ঘরোয়া 'বুল-টেরিয়ার'গুলো। বর্তমানে একটি 'বুল টেরিয়ার' পরম আদরের আর প্রিয় পাত্র আমার। তার আছে একটা সুদীর্ঘ বংশ পরিচয়, একটা বাঁকানো লেজ আর কুকুররাজ্যে সবচেয়ে হাস্যকর দেখতে মুখমণ্ডল। মনে হয়, আমার কুকুর বন্ধুরা আমার শারীরিক সীমাবদ্ধতার বিষয়টা বুঝতে পারে, তাই আমি যখন একলা থাকি, তখন সে আমার খুব কাছে থাকে। আমি ভালোবাসি তাদের লেজ নাড়ানো আর মমতা প্রকাশ করার ভঙ্গিটা।

www.amarboi.org

যখন কোনো বাদলা দিন আমাকে ঘরে আটকে রাখে, আমি নিজেকে নিয়ে মজায় থাকি অন্য মেয়েদের মতোই। কোনো কিছু বোনা আর কুরুশের কাজ করতে পছন্দ করি আমি, আমি ইচ্ছেমতো ভালোলাগা কিছু পড়ি, এখানে ওখানে লাইনও টানি, আর হয় তো এক দু'দান বাঘবন্দি অথবা দাবাও খেলি আমার কোনো বন্ধুর সাথে। আমার একটা বিশেষ বোর্ড আছে যার ওপর আমি এই খেলাগুলো খেলি। এতে বর্গক্ষেত্রগুলো কাটা আছে, যাতে ঘুঁটিগুলো দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পারে। কালো বোড়েগুলোর মাথা সমতল এবং শাদা বোড়েগুলোর মাথা খোদাই করা। প্রত্যেকটা বোড়ের মাঝখানে ছিদ্র করা আছে, তাতে আটকানোর ব্যবস্থা আছে একটা পিতলের শক্ত গাঁট যাতে করে অন্য ঘুঁটিগুলো থেকে আলাদা করা যায় রাজাকে। বোড়েগুলোর আকারেও আছে পার্থক্য, শাদা আকারের বোড়েগুলো কালোগুলোর চেয়ে বড়। ফলে আমার বিপক্ষের চাল বুঝতে অসুবিধা হয় না, বোর্ডের ওপর চাল দেয়ার পর আমার হাত বোর্ডের ওপর বোলাতেই বুঝতে পারি চালগুলো। একটা ঘর থেকে বোড়ে তুলে এনে অন্য ঘরে রাখতে যে ঝাঁকুনি হয় তা আমাকে বলে দেয় কখন আমার পালা বা দান এলো।

যখন আমি একা থাকি বা আলসে মেজাজে থাকি তখন পেসেন্ট বা একজনের উপযোগী তাস খেলি, এ খেলাটি আমার খুব পছন্দের। আমি এমন তাস দিয়ে খেলি, যাদের ডান দিকের ওপরের কোণে ব্রেইল চিহ্ন ছাপা থাকে। ওটাই আমাকে তাসের ফোটা বা মূল্য বুঝিয়ে দেয়।

যদি আমার আশপাশে শিশুরা থাকে, তবে তাদের সাথে আমোদপ্রমোদ করার মতো আনন্দ পাই না আর কিছুতে। এমন কী খুব ছোট্ট শিশুর সাহচর্যও আমার ভালো লাগে, আর আমি আনন্দ পাই এই কথা জানাতেও যে শিশুরা আমাকে পছন্দ করে। তারা আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় আর আমাকে সেই সব জিনিস দেখায় যেগুলোতে তাদের আগ্রহ থাকে। অবশ্য ছোটরা কেউই তাদের আঙুল দিয়ে বানান করে কিছু লিখতে পারত না আমার হাতে; কিন্তু আমি তাদের ঠোঁট স্পর্শ করে তাদের কথা বুঝে নিতাম। যদি আমি ঐভাবেও বুঝতে না পারতাম তা হলে তারা আমাকে বোঝানোর জন্য মুকাভিনয়ের সাহায্য নিত। কখনও কখনও আমি তাদের মুকাভিনয় বুঝতে ভুল করতাম। তখন তারা শিশুসুলভ হাসিতে ফেটে পড়ে আমার ভুল করাকে স্বাগত জানাত এবং আবার মুখাভিনয় শুরু করত প্রথম থেকে। আমি প্রায়ই তাদের গল্প বলি অথবা তাদের কোনো খেলা শেখাই। এভাবে সময় যেন উড়ে যায় ডানায় ভর করে এবং আমাদের ভালো আর সুখী করে রেখে যায়।

যাদুঘর আর শিল্পকলার বিপণিগুলোও আনন্দ আর প্রেরণার উৎস। সন্দেহ নেই অনেকের কাছেই এটা অদ্ভুত মনে হবে যে, দৃষ্টি শক্তির সাহায্য ছাড়াই শীতল মার্বেল পাথরে কোনো হাত কীভাবে অনুভব করতে পারে কোনো কর্মতৎপরতা, আবেগ, সৌন্দর্য। তবুও এটা সত্যি যে আমি মহৎ শিল্পকর্ম হাত দিয়ে স্পর্শ করে উপভোগ করি অকৃত্রিম আনন্দ। যখনই আমার আঙুলের অগ্রভাগ কোনো ভাস্কর্যের রেখা এবং

www.amarboi.org

বক্ররেখা ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যায় তারা আবিষ্কার করে শিল্পীর ভাবনা আর আবেগকে যা শিল্পী করে দেন মূর্ত। আমি অনুভব করতে পারি দেবতাদের আর বীর নায়কদের মুখমণ্ডল ও তাদের মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত ঘৃণা, সাহসিকতা আর ভালোবাসাও। ঠিক যেমনভাবে আমি জীবন্ত মানুষের মুখমণ্ডল স্পর্শ করে ওগুলো অনুভব করতে পারি, অবশ্য যদি আমাকে অনুমতি দেওয়া হয় স্পর্শ করার। আমি ডায়নার দেহভঙ্গিতে অনুভব করি বনানীর লাবণ্য আর স্বাধীনতা এবং সেই শক্তিকে যা পোষ মানায় পার্বত্য সিংহকে আর বশীভূত করে তীব্রতম কামনাকেও। বারে-এর ব্রোঞ্জ মূর্তিগুলো অরণ্যের গোপনীয়তা আর রহস্য উন্মোচিত করে আমার অন্তরাত্মা বিমোহিত হয়, শান্তি লাভ করে।

হোমারের মুখ আঁকা একটা পদক ঝোলে আমার পড়ার ঘরের দেয়ালে, যথেষ্ট সুবিধাজনকভাবে নিচে ঝোলানো যাতে ভালোবাসায় আর শ্রদ্ধায় আমি সহজেই তার নাগাল পাই এবং স্পর্শ করতে পারি হোমারের সুন্দর বিষণ্ন মুখমণ্ডল। আমি কী নিবিড়ভাবেই না জানি সেই রাজকীয় ললাটের প্রতিটি রেখা– তাতে চিহ্নিত আছে জীবনের কঠিন সংগ্রাম আর দুঃখ, ঐ দৃষ্টিহীন চোখ দুটি, এমন কি শীতল প্লাস্টারেও খুঁজে বেড়াচ্ছে তাঁর প্রিয় হেলাস-এর আলো আর নীল আকাশ। কিন্তু বৃথাই তাঁর সে খোঁজার চেষ্টা; সেই সুন্দর মুখ, যা দৃঢ়, সত্য এবং কোমল ছিল। সে মুখ ছিল এক কবিরই যিনি পরিচিত ছিলেন দুঃখের সাথে। আঃ, কী ভালোভাবেই না আমি বুঝতে পারি অনুভব করতে পারি তাঁর প্রতি প্রবঞ্চনা– অনুভব করতে পারি অনন্ত রাতকে যার মধ্যে বাস করতে হয়েছে তাঁকে–

'উঃ আঁধার কেবলই আঁধার, দুপুরের এ উজ্জ্বল আলোতেও–
অনপনেয় আঁধার, পূর্ণ গ্রাস যেন,–
এক অন্তহীন নিশি, নেই কোনো আশা দিনের কখনও।'

কল্পনায় আমি শুনতে পাই হোমার গাইছেন। যেন টলমল, দ্বিধান্বিত পদে, অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন তাঁর পথ, শিবির থেকে শিবিরান্তরে– গাইছেন জীবনের, ভালোবাসার আর যুদ্ধের গান। গান গাইছেন এক মহান জাতির অনবদ্য সাফল্যেরও। এটা ছিল এক অনবদ্য গৌরবগাথা, এটা জিতে এনেছিল অন্ধ কবির জন্য এক শাশ্বত মুকুট– সে মুকুট সকল যুগের প্রশংসা।

আমি কখনও আশ্চর্য হয়ে ভাবি, ভাস্কর্যের সৌন্দর্য বিচার করার ক্ষেত্রে, চোখের চেয়ে হাত বেশি সংবেদনশীল কিনা। আমার মনে হয় তাদের দেবদেবীগুলোর মর্মর মূর্তিগুলোর মধ্যে ভাস্কর্যের ছন্দময় রেখাগুলো আর বক্রভঙ্গিগুলো অনেক সূক্ষ্মভাবে অনুভব করতে পারি গ্রিক জাতির জীবন স্পন্দন।

আর একটা আনন্দ, যা আসে অন্যসব আনন্দের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কমই, তা হলো থিয়েটার-এ যাওয়া। কোনো নাটক অভিনীত হওয়ার সময়ই তা আমার কাছে বর্ণনা করলে আমি তা উপভোগ করি পড়ার চেয়ে অনেক বেশি। কয়েকজন মহান অভিনেতা এবং অভিনেত্রীর সাথে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়,

www.amarboi.org

যাঁদের ক্ষমতা আছে দর্শকদের এমনভাবে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখার যে তখন দর্শকরা ভুলে যান সময় আর স্থান আর বাস করেন এক রোমান্টিক বা অলীক জগতে। আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল মিস এলেন টেরি-এর সাজপোশাক আর তাঁর মুখমণ্ডল স্পর্শ করার যখন তিনি মূর্ত করে তুলেছিলেন আমাদের ভাবনায় থাকা এক রানীর চরিত্র। এবং সেই সময়ে তাঁকে ঘিরে যে স্বর্গীয় সুষমা প্রকাশিত হয়েছিল তা মহত্ত্বম দুঃখকেও আড়াল করে। তাঁর পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন স্যার হেনরি আরভিং, যিনি পরিধান করেছিলেন রাজকীয় প্রতীকসমূহ। তাঁর সমস্ত দেহভঙ্গিমায় আর আচরণে ছিল এক রাজকীয় ব্যক্তিত্ব, যা প্রশমিত করে আর জয় করে সংবেদনশীল মুখমণ্ডলকে। তাঁর রাজার মুখবয়বে তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন এক দুরত্ব আর অনধিগম্য দুঃখের ভাব যা আমি কখনও ভুলব না।

আমি মি. জেফারসনকেও চিনি। আমি গর্বিত তাঁকে আমার বন্ধুদের মধ্যে গন্য করতে পেরে। আমি তাঁকে দেখতে যাই যখনই, তখনই তিনি অভিনয় করছেন। প্রথম যে-বার আমি তাঁকে অভিনয় করতে দেখেছিলাম, আমি ছিলাম নিউইয়র্কের এক স্কুলে। তিনি অভিনয় করেছিলেন রিপ ভ্যান উইঙ্কিল-এর ভূমিকায়। আমি প্রায়ই গল্পটা পড়তাম কিন্তু কখনই রিপ-এর ধীর অদ্ভুত মনোরম সহৃদয় আচরণে অত মুগ্ধ হইনি যেমনটি হয়েছিলাম মঞ্চাভিনয় দেখে। মি. জেফারসনের সুন্দর এবং মর্মস্পর্শী উপস্থাপনা আমাকে অভিভূত করেছিল, আপ্লুত করেছিল আনন্দে। মনে হয় আমার আঙুলগুলোতে রিপের এমন ছবি আঁকা রয়েছে যা তারা কখনও হারাবে না। অভিনয় শেষ হওয়ার পর মিস সুলিভান আমাকে পর্দার পিছনে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর সাথে দেখা করাতে এবং ঐ সময় আমি অনুভব করেছিলাম তাঁর বিচিত্র ধরনের পোশাক আর লম্বা চুল ও ঝোলা দাড়ি। মি. জেফারসন আমাকে তাঁর মুখমণ্ডল স্পর্শ করার অনুমতি দিয়েছিলেন যাতে আমি অনুভব করতে পারি কুড়ি বছর ধরে ঘুমোনো সেই আজব ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর তাকে দেখতে কেমন লাগছিল, আর তিনি আমাকে অভিনয় করে দেখিয়েছিলেন বেচারা বৃদ্ধ রিপ টলতে টলতে হাঁটছিল।

আমি মি. জেফারসনকে দেখেছি 'দ্য রাইভ্যাল্‌স' নাটকেও। একবার বস্টনে যখন আমি তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তিনি 'দ্য রাইভ্যাল্‌স' নাটকের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশগুলো অভিনয় করে দেখিয়েছিলেন। সেই অভ্যর্থনা কক্ষটি, যেখানে আমরা বসেছিলাম তাকেই ব্যবহার করা হয়েছিল মঞ্চ হিসাবে। তিনি এবং তাঁর ছেলে বড় টেবিলে বসেছিলেন, এবং বব একস্ লিখেছিল দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে চিঠি। আমি হাত দিয়ে তাঁর সব চালচলন অনুভব, অনুসরণ করছিলাম এমনভাবে, যা অনুভব করা অসম্ভব হতো যদি ব্যাপারটা আমার হাতে লিখে দেওয়া হতো। তারপর তারা দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করতে উঠে দাঁড়াল, এবং আমি অনুসরণ করছিলাম তাদের দ্রুত তরবারি দিয়ে আঘাত করা আর তা ঠেকানো, বেচারা বব-এর ভয়ে কাঁপুনি দেখছিলাম যখন তার সাহস চুইয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল আঙুলের ডগা দিয়ে তারপর সেই মহান অভিনেতা তাঁর কোটটা একটু টেনে ঝাঁকুনি দিলেন। মুখ করলেন কুঞ্চিত আর

www.amarboi.org

মুহূর্তের মধ্যে আমি যেন পৌঁছে গেলাম ফলিং ওয়াটার গ্রামে এবং স্লাইডারের লম্বা কোঁচকানো ও অমসৃণ কেশদামসহ মাথাটা অনুভব করলাম আমার হাঁটুর ওপর। মি. জেফারসন 'রিপ ভ্যান উইঙ্কিল' থেকে আবৃত্তি করলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সংলাপগুলো যাতে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসে কান্না। তিনি আমাকে যতদূর সম্ভব সেইরকম অঙ্গভঙ্গি ও কাজ করে দেখাতে বলেছিলেন যেগুলো আবৃত্তি করা পংক্তিগুলোর সাথে মানানসই হবে। অবশ্য নাটকের কোনো ধরনের কাজ সম্বন্ধে আমার ধারণা না থাকায় আমি শুধু এলোমেলোভাবে কিছু ধারণা অভিনয় করে দেখাতে পেরেছিলাম; কিন্তু অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তিনি অভিনয় প্রক্রিয়া সংলাপগুলোর সাথে মানানসই ভাবে করে দেখিয়েছিলেন। রিপ-এর দীর্ঘশ্বাস আর বিড় বিড় করে বলা, 'একটা মানুষ চলে গেলে লোকে এত তাড়াতাড়ি ভুলে যায়!' দীর্ঘ ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর যে আতঙ্ক নিয়ে তার কুকুর এবং বন্দুক খুঁজে বেড়ায়, ডেরিকের সাথে চুক্তি করা নিয়ে যে হাস্যকর দ্বিধা দেখায় সে– এসব কিছুই মনে হয় জীবন থেকেই নেয়া, এটাই হলো আদর্শ জীবন যেখানে ঘটনাসমূহ ঘটে যেমনটি আমরা ঘটা উচিত বলে মনে করি।

আমার ভালোভাবেই মনে আছে যখন আমি প্রথম বার থিয়েটারে গিয়েছিলাম। এটা ছিল বারো বছর আগের ঘটনা। শিশু অভিনেত্রী এলসি লেসলি বস্টনে ছিল এবং মিস সুলিভান আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন 'দ্য প্রিন্স অ্যান্ড দ্য পপার' নাটকে তার অভিনয় দেখার জন্য। আমি কখনোই ভুলব না সেই সুন্দর নাটিকাটি যাতে– পর্যায়ক্রমে আনন্দ আর বেদনার ঢেউ বয়ে গিয়েছিল অথবা ভুলে যাব না সেই বিস্ময়কর শিশুটিকে যে অভিনয় করেছিল তাতে। নাটকটি অভিনীত হয়ে যাওয়ার পর আমাকে পর্দার পেছনে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং রাজকীয় পোশাক পরা অবস্থায় থাকা তার সাথে দেখা করেছিলাম। এলসির থেকে বেশি সুন্দর আর বেশি ভালোবাসতে পারা যায় এমন শিশু খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সে মেঘের মতো সোনালি একমাথা চুল যা তার ঘাড়ের ওপর ভাসছিল তা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল উজ্জ্বল হাসি মুখে। যদিও দীর্ঘ সময় ধরে বিপুলসংখ্যক দর্শকদের সামনে সে অভিনয় করেছিল তবুও তার আচরণের মধ্যে ছিল না কোনো সংকোচ বা ছিল না ক্লান্তির ছাপ। সেই সময় আমি মাত্র কথা বলতে শিখছিলাম এবং তার নামটা ঠিকভাবে বলার জন্য আগেই আমি তার নামটা বারবার উচ্চারণ করেছিলাম যতক্ষণ পর্যন্ত না সেটা সঠিকভাবে বলতে পেরেছিলাম। কল্পনা করে দেখ আমার আনন্দ, যখন আমি তাকে অল্প যে কটি কথা বলেছিলাম তা বুঝতে পেরেছিল এবং বিনা দ্বিধায় তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল আমাকে শুভেচ্ছা জানাতে।

তা বলে কি এটা সত্য নয় যে আমার জীবন তার সব সীমাবদ্ধতা নিয়েও স্পর্শ করে এই সুন্দর পৃথিবীর নানা বিন্দুকে? প্রত্যেক জিনিসেই আছে তার নিজস্ব বিস্ময়কর বস্তুসমূহ, এমনকি তা আছে আঁধার আর নিস্তব্ধতার মধ্যেও। এবং আমি শিখি, যে অবস্থাতেই আমি থাকি না কেন, সেখানেই আমি তৃপ্ত।

www.amarboi.org

এটা ঠিকই, কখনও কখনও একটা বিচ্ছিন্নতাবোধ আমাকে জড়িয়ে ধরে একটা শীতল কুয়াশার মতো যখন আমি একাকী বসে থাকি আর অপেক্ষা করি জীবনের বন্ধ হয়ে যাওয়া দরজার সামনে। ঐ দরজা অতিক্রম করলেই আছে মিষ্টি-মধুর সখ্যও। সেখানে হয়তো প্রবেশ করতে পারব না কোনোদিনও। নীরব, নির্দয় অদৃষ্ট সেখানে রোধ করে আছে পথ। আমি উৎসুক হয়ে তার কর্তৃত্বপূর্ণ নির্দেশকে প্রশ্ন করতে চাই, কারণ আমার হৃদয় বিক্ষিপ্ত আর আবেগপূর্ণ। তবুও আমার জিভ উচ্চারণ করবে না তিক্ত নিরর্থক সে শব্দ যেগুলো আমার ঠোঁট দুটিতে উঠে আসে, আর তারা না পড়া অশ্রুবিন্দুর মতো ফিরে আসে আমার অন্তরে। নৈঃশব্দ অপরিমেয় হয়ে বসে থাকে আমার অন্তরাত্মায়। তারপর আশা মৃদু হাসে আর বলে মৃদু স্বরে ফিসফিস করে, 'আনন্দ আছে আত্মা বিস্মরণে।' তাই আমি চেষ্টা করি, করে নিতে চাই অপরের চোখের আলোকে আমারই সূর্যের আলো, অপরের কানে বাজতে থাকা সুরকে আমার ঐকতান, আর অন্যের ঠোঁটে লেগে থাকা মৃদু হাসিকে আমারই সুখ।

www.amarboi.org

তেইশ

যদি এমন হতো যে, সেই সমস্ত মানুষদের নাম উল্লেখ করে আমি সমৃদ্ধ করতে পারতাম আমার এই আলেখ্যটিকে, যাঁরা জীবনে আনন্দলাভে সাহায্য করেছেন আমাকে! তাঁদের কারও কারও নাম পাওয়া যাবে আমাদের সাহিত্যে এবং তাঁরা অনেকেরই হৃদয়ের প্রিয়জন, আবার অন্যেরা বেশিরভাগ অচেনা হতে পারেন আমার পাঠকদের কাছে। কিন্তু প্রভাব খ্যাতি অর্জন না করতে পারলেও, তাঁরা অমর হয়ে থাকবেন সেই সব জীবনের কাছে, যাঁদের জীবনকে তাঁরা করেছেন মধুর আর মহান। সেগুলোই আমাদের জীবনের লাল রঙে রাঙানো দিন, যখন আমরা মিশি এমন সব মানুষদের সাথে যাঁরা আমাদের রোমাঞ্চিত করেন সুন্দর কবিতার মতো, সেই-সমস্ত মানুষেরা যাঁদের উষ্ণ করমর্দন পূর্ণ থাকে অনুচ্চারিত সমবেদনায়, এবং যাঁদের মধুর আর সমৃদ্ধ স্বভাব আমাদের উৎসুক ও অধৈর্য হৃদয়কে এনে দেয় অপূর্ব প্রশান্তি যা স্বর্গীয় ভাবেরই নির্যাস। যে সব বিহ্বলতা, বিরক্তি আর উদ্বেগ আমাদের মগ্ন করে রাখে, তারা চলে যায় অসুন্দর স্বপ্নদের মতো, আর আমরা জেগে উঠি নতুন দৃষ্টি নিয়ে, নতুন কান নিয়ে সৌন্দর্য আর ভগবানের যথার্থ বিশ্বে। যে নিরানন্দ শূন্যতা জুড়ে আছে আমাদের প্রাত্যাহিক জীবনে, হঠাৎই তা প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে সম্ভাবনায়। এক কথায়, যখন অমন বন্ধুরা থাকে আমাদের কাছে, আমরা অনুভব করি সব ভালো আছে। সম্ভবত আমরা তাদের দেখিনি কখনও, হয়ত তারা কখনও আমাদের জীবনের পথে পা বাড়াবে না; কিন্তু তাদের প্রশান্তির আর কোমলতার প্রভাব যেন জলসিঞ্চন করে আমাদের অসন্তোষে, আর আমরা এর আরোগ্যকারী স্পর্শ অনুভব করি, যেমন মহাসাগর অনুভব করে, পাড়ি দেয়া কোনো মিষ্টি নদী তার লবণাক্ততা হ্রাস করে।

আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করা হয়, 'তোমাকে লোকেরা বিরক্ত করে তোলে না?' আমি বুঝতে পারিনা ওরা ঠিক কী বলতে চায়। আমার মনে হয়, নির্বোধ ও কৌতূহলী, বিশেষত খবরের কাগজের রিপোর্টারদের দেখা করতে আসা অসময়োচিত হয় সব সময়ই। আমি সেই ধরনের লোকদের অপছন্দ করি যারা আমার বোধশক্তিকে অশ্রদ্ধা করে। এই মানুষগুলি আসলে সেই রকম, যারা চলার সময় পা ফেলতে থাকে ছোট করে, দুক্ষেত্রেই এই ভণ্ডামি উত্ত্যক্তকর।

সেই সব হাতগুলো, যাদের স্পর্শ করতে পেরেছি আমি, নীরব থেকেও যেন কথা বলে তারা। কিছু হাতের স্পর্শ থাকে যা ধৃষ্ট, অশিষ্ট। আমি কিছু লোকের সাথে মিশেছি। তারা এত আনন্দশূন্য যে, যখন আমি জড়িয়ে ধরেছি তুষারের মতো শীতল আঙুলের ডগা, তখন এমন মনে হয়েছে আমি করমর্দন করছি উত্তর-পূর্বের ঝোড়ো হাওয়ার সাথে। আবার অনেকেই আছে, যাদের হাতে যেন ধরা আছে সূর্যকিরণ,

www.amarboi.org

তাদের সাথে করমর্দনে উষ্ণ হয় আমার হৃদয়। হতে পারে তা কোনো জড়িয়ে ধরে থাকা শিশুর হাতের স্পর্শ, কিন্তু তার মধ্যেই ততটা শক্তিশালী সূর্যকিরণ থাকতে পারে আমার জন্যে, যা অন্যদের জন্য আছে একটা ভালোবাসা পূর্ণ চাউনিতে। একটা আন্তরিক করমর্দন অথবা বন্ধুত্বপূর্ণ চিঠি আমাকে দেয় প্রকৃত আনন্দ।

আমার অনেক দূরের বন্ধু আছে যাদের আমি দেখিনি কখনও। বাস্তবিক, তাদের সংখ্যা এত যে, আমি প্রায়ই তাদের চিঠির উত্তর দিতে অপারগ হই; কিন্তু আমি এখানে বলতে চাই তাদের সহৃদয় কথাগুলোর জন্য আমি সবসময়ই তাদের কাছে কৃতজ্ঞ– সেই চিঠিগুলোর প্রাপ্তি স্বীকার যত কমই করে থাকি না কেন।

আমি এটাকেই জীবনের বিশেষ সৌভাগ্যগুলোর মধ্যে একটা বলে মনে করি যে, আমি অনেক প্রতিভাবান মানুষের সাথে পরিচিত হয়েছি এবং কথাও বলেছি। যারা বিশপ ব্রুকসকে জানতেন, তাঁরাই উপলব্ধি করতে পারবেন তাঁর বন্ধুত্ব লাভের আনন্দ। ছোট শিশু হিসাবে আমি ভালোবাসতাম তাঁর কোলে বসতে এবং তার বিশাল হাত জড়িয়ে ধরে থাকত আমার এক হাতে, আর অন্য হাতে মিস সুলিভান বানান করে করে লিখতেন বিশপের অনুপম উপদেশগুলো। আমি শিশুর বিস্ময়ে আর অপার আনন্দে শুনতাম তাঁর কথা। এটা ঠিকই আমার অন্তরাত্মা তাঁর আত্মার উচ্চতায় পৌঁছতে পারত না, কিন্তু তিনি আমাকে দিয়েছিলেন জীবনে প্রকৃত আনন্দের অনুভব এবং আমি কখনই কোনো অপূর্ব চিন্তাধারা না নিয়ে তার সঙ্গ ত্যাগ করতাম না, যা আমার বয়স বাড়ার সাথে সাথে সৌন্দর্যে আর অর্থের গভীরতায় বেড়েছিল। একবার আমি বিভ্রান্ত হয়ে জানতে চেয়েছিলাম, পৃথিবীতে এতরকমের ধর্ম আছে কেন, তিনি বলেছিলেন, 'পৃথিবীতে একটা সর্বজনীন ধর্ম আছে, হেলেন, সেটা হলো ভালোবাসার ধর্ম। তোমার স্বর্গের পিতাকে ভালোবাস মন প্রাণ দিয়ে, আর তোমার পক্ষে যতবেশি ভালোবাসা সম্ভব ঈশ্বরের প্রতিটি সন্তানকে ভালোবাস, আর একটা কথা মনে রেখ, সব শুভরই অশুভর চেয়ে সম্ভাবনা বেশি। এটাও মনে রেখ, তোমার কাছেই আছে স্বর্গে প্রবেশের চাবি।' এবং তাঁর জীবনই ছিল এই মহান সত্যের একটা সুন্দর উদাহরণ। তাঁর মহান হৃদয়ে এসে মিশেছিল বহুধা বিস্তৃত জ্ঞান, তার সাথে ছিল বিশ্বাস, যা পরিণত হয়েছিল অন্তর্দৃষ্টিতে। তিনি দেখেছিলেন :

'যা কিছু মুক্ত করে, করে ঊর্ধ্বগামী, আছেন তিনি তাতে,
যা কিছু নিতান্ত তুচ্ছ, করে সব মধুময় দেয় সান্ত্বনা আছেন তাতেও।'

বিশপ ব্রুকস আমাকে বিশেষ কোনো ধর্মমত অথবা সংস্কার শেখাননি; কিন্তু তিনি আমার অন্তরে মুদ্রিত করে দিয়েছিলেন দুটি মহৎ ধারণা– ঈশ্বরের পিতৃত্ববোধ, আর মানুষের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা। তিনি আমাকে অনুভব করতে শিখিয়ে ছিলেন যে ঐ সত্য দুটি লুকিয়ে আছে সব ধর্মবিশ্বাসের আর সর্বপ্রকার পূজা-অর্চনার মধ্যে। ঈশ্বর প্রেম, আর ঈশ্বরই আমাদের পরম পিতা, আমরা তাঁর সন্তান। সুতরাং আঁধারতম মেঘ একদিন কেটে যাবেই, আর যদি ন্যায়ের পতন হয়ও কোনোদিন, অন্যায় জয়ী হবে না কখনও।

www.amarboi.org

আমি এই পৃথিবীতে এত সুখী যে, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করি না বিশেষ এটুকু মনে করা ছাড়া– আমার কিছু প্রিয় বন্ধু সেখানে অপেক্ষা করে আছে আমার জন্যে, ঈশ্বরের কোনো রমণীয় জগতে। বহু বছর পার হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও, তাদের এত কাছের বলে মনে হয় আমার যে, আমি মোটেও অবাক হব না, যদি যে কোনো মুহূর্তে তারা আমার হাত চেপে ধরে আর প্রিয় কথা বলে, যেমন তারা বলত এখান থেকে চলে যাওয়ার আগে।

বিশপ ব্রুকস-এর মৃত্যুর পর আমি বাইবেল পড়েছি অদ্যোপান্ত। পড়েছি কিছু ধর্ম সম্পর্কে লেখা দার্শনিক গ্রন্থও, তাদের মধ্যে আছে সুইডেনবর্গ-এর 'হেভেন অ্যান্ড হেল' এবং ড্রুমন্ড-এর 'অ্যাসেন্ট অব ম্যান', এবং আমি কোনো ধর্মমত বা রীতির সন্ধান পাইনি যা বিশপ ব্রুকস-এর ভালোবাসার মতবাদের চেয়ে অধিকতর তৃপ্ত করে আত্মাকে। আমি মি. হেনরি ড্রুমন্ডকে চিনতাম। তার শক্তিশালী উষ্ণ হাতের সাথে করমর্দন-এর স্মৃতি রোম্যান ক্যাথলিক গির্জা কর্তৃক প্রদত্ত আশীর্বাদের মতো। বন্ধুদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে সহানুভূতিশীল। তিনি বহুকিছু জানতেন এবং এত অমায়িক ছিলেন যে, তার সাহচর্যে নীরস অনুভব করা ছিল অসম্ভব।

আমার খুব ভালোভাবে মনে আছে যখন প্রথমবার আমি ডা. ওয়েন্ডেল হোমসকে দেখেছিলাম। তিনি মিস সুলিভান এবং আমাকে এক রবিবার বিকেলে তাঁর সাথে দেখা করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এটা ছিল বসন্তকালের গোড়ার দিক এবং ঠিক সেই সময়ই আমি প্রথম কথা বলতে শিখেছিলাম। আমরা পৌঁছানোর সাথে সাথেই আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাঁর পড়ার ঘরে যেখানে আমরা তাঁকে খোলা আগুনের পাশে একটা হাতলওয়ালা বড় চেয়ারে বসে থাকতে দেখেছিলাম। আগুনটা চটপট আওয়াজ করে একটা 'ফায়ারপ্লেসে' জ্বলছিল। তিনি বললেন, তিনি অন্য কোনো একদিনের কথা চিন্তা করছেন।

'এবং শুনছিলেন চার্লস নদীর কুল কুল ধ্বনি,' আমি ইঙ্গিত করলাম।

'হ্যাঁ, চার্লস-এর সাথে আমার অনেক প্রিয় স্মৃতি জড়িয়ে আছে,' জবাব দিলেন তিনি। ঘরের মধ্যে ছিল ছাপাখানার কাগজ কালি আর চামড়ার একটা গন্ধ যা আমাকে বলে দিচ্ছিল যে ঘরটা বই-এ ভর্তি আর সহজাত প্রবৃত্তিতেই আমি হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম তাদের পাওয়ার জন্যে। আমার আঙুল নেমে এসেছিল টেনিসনের একটা সুন্দর কবিতা সংকলনের ওপরে এবং মিস সুলিভান আমাকে বই-এর নাম বলে দিলেন এবং আমি আরম্ভ করলাম আবৃত্তি করতে :

'ভেঙে পড়, ভেঙে পড়, ভেঙে পড়
তোমার শীতল ধূসর প্রস্তরখণ্ডের ওপর, হে সমুদ্র!'

কিন্তু হঠাৎই থেমে গেলাম আমি। আমি আমার হাতে অনুভব করলাম চোখের জলের স্পর্শ। আমি আমার প্রিয় কবিকে কাঁদিয়েছি, এ কথা ভেবে গভীর বেদনা বোধ করেছিলাম। তিনি আমাকে বসালেন তার হাতলওয়ালা চেয়ারে আর নানা

www.amarboi.org

আকর্ষণীয় জিনিস দিয়েছিলেন পরীক্ষা করে দেখার জন্য এবং তার অনুরোধে আমি আবৃত্তি করেছিলাম 'The Chambered Nautilus' যেটা তখন ছিল আমার প্রিয় কবিতা। এর পরে আমি ডা. হোমস-এর সাথে দেখা করেছিলাম এবং তাঁকে একজন ব্যক্তি হিসাবে এবং কবি হিসাবেও ভালোবাসতে শিখেছিলাম।

ডা. হোমসের সাথে দেখা হওয়ার খুব বেশিদিন পরে নয়। এক সুন্দর গ্রীষ্মের দিনে মিস সুলিভান এবং আমি হুইটিয়ার এর মেরিম্যাক-এর নিরালা বাড়িতে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তাঁর ভদ্র সৌজন্য এবং অদ্ভুত অথচ মনোরম বাচনভঙ্গি আমার হৃদয় জয় করে নিয়েছিল। তাঁর নিজের লেখা একটা বই উঁচু অক্ষরে অর্থাৎ ব্রেইল অক্ষরে ছাপানো ছিল; যেখান থেকে আমি 'ইন স্কুল ডেইজ' কবিতাটি পড়েছিলাম। তিনি খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন এটা দেখে যে, আমি শব্দগুলো এত সুন্দরভাবে উচ্চারণ করতে পেরেছিলাম এবং বলেছিলেন আমার কথা বুঝতে তাঁর কোনো অসুবিধা হয়নি। তারপর আমি তাঁর কবিতাটা সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করেছিলাম এবং তাঁর ঠোঁটের ওপর আমার আঙুল রেখে তাঁর উত্তরগুলো পড়ে ফেলেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, ঐ কবিতার ছোট্ট ছেলেটি ছিলেন তিনি নিজে এবং ছোট্ট মেয়েটির নাম ছিল স্যালী এবং আর কী বলেছিলেন তা আমি ভুলে গেছি। আমি আবৃত্তি করেছিলাম Laus Deo-ও এবং আমি যখন শেষ পংক্তিগুলো পড়ছিলাম, তিনি আমার হাতে একটা ক্রীতদাসের মূর্তি রেখেছিলেন। মূর্তিটির নুয়ে পড়া শরীর থেকে পায়ের বেড়িগুলো খুলে পড়ে যাচ্ছিল, ঠিক যেভাবে বেড়িগুলো খুলে পড়েছিল তার অবয়ব থেকে, যখন দেবদূত তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল– কারাগারের বাইরে। পরে আমরা তাঁর পড়ার ঘরে গিয়েছিলাম, এবং তিনি আমার শিক্ষিকার জন্য তাঁর সই দিয়েছিলেন– 'আপনার প্রিয় ছাত্রীর মনকে বন্দীদশা থেকে মুক্তি দেয়ার মহান কাজের ভূয়সী প্রশংসায়, আমি আপনার যথার্থ বন্ধু হিসাবে, জন জে. হুইটিয়ার' এবং প্রশংসা করেছিলেন মিস সুলিভানের কাজের। আমাকে বলেছিলেন, 'উনি তোমার আত্মিক পরিত্রাতা।' তারপর তিনি আমাকে সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিলেন এবং স্নেহভরে চুম্বন করেছিলেন আমার কপালে। আমি তাঁকে কথা দিয়েছিলাম পরের গ্রীষ্মকালে আবার আসব, কিন্তু তিনি মারা গিয়েছিলেন আমার সেই অঙ্গীকার রক্ষা করার আগেই।

ডা. এডোয়ার্ড এভারেট হেইল হলেন আমার বহু পুরোনো বন্ধুদের একজন। তাঁকে চিনি আমার আট বছর বয়স থেকে এবং তাঁর প্রতি ভালোবাসা বেড়েছে আমার বয়স বাড়ার সাথে সাথে। তাঁর বিচক্ষণ এবং স্নেহপূর্ণ সহানুভূতি ছিল আমার অবলম্বন মিস সুলিভান-এর প্রতি এবং তাঁর শক্তিশালী হাত আমাদের বহু বন্ধুর পথ পার হতে সাহায্য করেছিল। তিনি আমাদের জন্য যা করেছেন, তা করেছেন সেই রকম হাজার হাজার মানুষের জন্য যাদের কঠিন কাজ সম্পাদন করতে হয়। তিনি পুরাতন ধর্মনীতির আবরণকে পূর্ণ করেছিলেন ভালোবাসার নতুন মদিরা দিয়ে, এবং মানুষকে দেখিয়েছেন বিশ্বাসের অর্থ কী, কীভাবে বাঁচতে হয়, আর হতে হয় মুক্ত। যা

www.amarboi.org

কিছু তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন, তা সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর নিজের জীবনে– দেশের প্রতি ভালোবাসা, স্বদেশের নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের প্রতি করুণা প্রদর্শন এবং এগিয়ে চলার প্রতি অকৃত্রিম বাসনা আর উঁচুতে ওঠার জন্য আন্তরিক ইচ্ছা। তিনি ছিলেন এক জন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা এবং মানুষকে প্রেরণাদানকারী, কথাকে কাজে পরিণত করার এক শক্তিধর কর্মবীর, তিনি বন্ধু ছিলেন সকল জাতির– ঈশ্বর যেন আশীর্বাদ করে তাঁকে!

আমি ইতিমধ্যেই ড. আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল-এর সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎকারের কথা লিখেছি। তারপর থেকে ওয়াশিংটনে তাঁর সাথে অনেক আনন্দময় দিন কাটিয়েছি এবং কেপ ব্রেটন দ্বীপের কেন্দ্রস্থলে থাকা তাঁর মনোরম বাড়িতেও। জায়গাটা ছিল ব্যাডেক-এর কাছে, সেটা ছিল একটা গ্রাম এবং এই গ্রামটা চার্লস ডাডলে ওয়ারনার-এর বই-এর জন্য বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। এখানেই ড. বেল-এর পরীক্ষাগারে, অথবা বিখ্যাত 'ব্রাসডি-অর' হ্রদের তীরে, অনেক আনন্দময় সময় কাটিয়েছি। আমাকে তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো সম্পর্কে যা বলার ছিল তা শুনে, এবং তাঁকে সাহায্য করেছি ঘুড়ি ওড়ানোতে, যার তিনি আশা করতেন যা দিয়ে ভবিষ্যতে আবিষ্কার করতে পারবেন সেই সূত্রগুলো যেগুলো নিয়ন্ত্রণ করবে বিমানপোত। ড. বেল বিজ্ঞানের বহু শাখাতেই বিশেষজ্ঞ ছিলেন আর তাঁর জানা ছিল সেই বিশেষ দক্ষতা যার দ্বারা তিনি যে বিষয়ে হাত দিতেন তাকে করে তুলতে পারতেন আকর্ষণীয়, এমনকি সেটা দুরুহ বিমূর্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হলেও। তিনি মানুষকে এইভাবে অনুপ্রাণিত করতেন যে, তাতে মনে হতো তোমার হাতে যদি কিছু বেশি সময় থাকত, তবে তুমিও, সম্ভবত একজন উদ্ভাবক হতে পারতে। তাঁর মধ্যে আছে কৌতুকপ্রিয়তা এবং কাব্যিক দিকও। শিশুদের প্রতি ভালোবাসাই হলো তাঁর সবচেয়ে শক্তিশালী আবেগ। এর চেয়ে বেশি সুখী অন্য কিছুতেই হতেন না যখন তিনি একটা বধির শিশুকে কোলে তুলে নিতেন। বধির শিশুদের জন্য তাঁর পরিশ্রম আশীর্বাদ হয়ে অমর হয়ে থাকবে অনাগত প্রজন্মের কাছেও। আমরা তাঁকে ভালোবাসি তিনি যে কীর্তি অর্জন করেছেন তার জন্য এবং অন্যদের মধ্যে যে উৎসাহ জাগিয়েছিলেন তার জন্যও।

যে দুবছর আমি নিউইয়র্কে কাটিয়েছিলাম সেই সময় আমার কথা বলার সুযোগ হয়েছিল অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে আমি যাঁদের নাম প্রায়ই শুনেছি। কিন্তু আমি কখনও এঁদের সাথে পরিচিত হওয়ার আশা করিনি। এঁদের মধ্যে অনেকের সাথে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মি. লরেন্স হাটনের বাড়িতে। আমার কাছে পরম সৌভাগ্যের বিষয় ছিল তাঁদের সুন্দর বাড়িতে মি. হাটন এবং প্রিয় মিসেস হাটনের সাথে দেখা করতে যাওয়া। এবং এঁদের পড়ার ঘর দেখা ও তাঁদের প্রতিভাবান বন্ধুরা তাঁদের সম্বন্ধে যে অনবদ্য অনুভূতিগুলো এবং উজ্জ্বল চিন্তা সম্বন্ধে লিখেছিলেন, তা সবই আমি পড়েছি। এটা যথাযথভাবেই বলা হয়েছে যে, মি. হাটন-এর মধ্যে সকলের মধ্য থেকে মহৎ চিন্তার আর সব থেকে বেশি দরদি

www.amarboi.org

অনুভূতিগুলোকে বের করে আনার ক্ষমতা রয়েছে। তাঁকে বোঝার জন্য 'আ বয় আই নিউ' পড়ার দরকার হয় না কারও– আমার পরিচিত মানুষদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে উদার, সবচেয়ে মধুর স্বভাবের 'বালক'। সমস্ত পরিস্থিতেই তিনি ছিলেন এক প্রকৃত বন্ধু। তিনি ভালোবাসার পদ চিহ্ন কুকুরের জীবনেও খুঁজে বেড়ান, যেমন তা খুঁজে বেড়ান প্রতিবেশী মানুষের জীবনে।

মিসেস হাটন আমার সত্যিকারের এবং পরীক্ষিত বন্ধু। মধুর যা কিছুর অধিকার আমি পেয়েছি, এবং অধিকার পেয়েছি যে সব মহার্ঘ বস্তুর, তার সব কিছুর জন্যই আমি তাঁর কাছে ঋণী। আমার কলেজে পড়াশোনা উন্নতির জন্য তিনি প্রায়ই আমাকে পরামর্শ দিতেন এবং সাহায্য করতেন। যখনই কোনো কাজ বিশেষভাবে অসুবিধাজনক মনে হয়েছে, এবং মনে হয়েছে নিরুৎসাহব্যঞ্জক, তিনি তখনই আমাকে চিঠি লিখেছেন যা আমাকে আনন্দ অনুভব করিয়েছে, করেছে সাহসীও। কেননা তিনি তাঁদের মধ্যে একজন, যাঁদের কাছ থেকে আমরা শিখি একটা কঠিন পীড়াদায়ক কর্তব্য পালন, যা পরবর্তী কর্তব্য পালনকে আরও বেশি সরল আর সহজ করে তোলে।

মি. হাটন আমাকে পরিচয় করে দিয়েছিলেন তাঁর অনেক সাহিত্যিক বন্ধুদের সাথে। তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট ছিলেন মি. উইলিয়াম ডিন হাওয়েলস এবং মার্ক টোয়েন। আমি পরিচিত হয়েছিলাম মি. রিচার্ড ওয়াটসন গিল্‌ডার এবং মি. এডমন্ড ক্লারেন্স স্টেডম্যান-এর সাথেও। আমি চিনতাম চার্লস ডাডলে ওয়ারনারকেও, যিনি ছিলেন একজন পরমানন্দদায়ক কাহিনীকার, ছিলেন একজন প্রিয়তম বন্ধু। তাঁর সহানুভূতি ছিল এত বিস্তৃত, তাঁর সম্বন্ধে একথা সত্যিই বলা যায় যে, তিনি সমস্ত জীবিত প্রাণীকূল এবং তাঁর প্রতিবেশীকে ভালোবাসতেন নিজের মতোই। একবার মি. ওয়ারনার আমার সাথে দেখা করাতে নিয়ে এসেছিলেন বনের প্রিয় কবি গ্রাম্য ও প্রকৃতি জীবনের কবি মি. জন বারোজকে। তাঁরা সকলেই ছিলেন অমায়িক এবং সহানুভূতিশীল আর আমি তাঁদের ব্যবহারের মাধুর্য অন্তরে অনুভব করেছিলাম, যেমন অনুভব করতাম তাঁদের প্রবন্ধসমূহের আর কবিতাগুলোর চমৎকারিত্ব। যখন এই সমস্ত সাহিত্য জগতের মানুষরা পলকে চলে যেতেন বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে, জড়িয়ে পড়তেন গভীর তর্ক বিতর্কে, আমি তাঁদের সাথে পাল্লা দিতে পারতাম না। তাঁদের কথোপকথন তীক্ষ্ণ ব্যঞ্জিত উক্তিতে এবং শোভন রসিকতা পূর্ণ বাক্যে আর বাক্যাংশে ঝকমক করত। আমি ছিলাম ছোট্ট অ্যাসকানিয়াস-এর মতো যে তার ছোট্ট পা ফেলে ফেলে অনুসরণ করত আইনিয়াসকে, যে বীরোচিত পা ফেলে এগিয়ে যেত মহাশক্তিশালী নিয়তির দিকে। কিন্তু এঁরা সকলেই অনেক মাধুর্যে ভরা কথা বলতেন আমাকে। মি. গিলডার আমাকে বলেছিলেন চাঁদের আলোতে বিশাল মরুভূমির বুকে আড়া-আড়িভাবে এপার থেকে ওপার ভ্রমণ করে পিরামিড দেখতে যাওয়ার কাহিনী, আর একটা চিঠিতে আমাকে লিখে জানিয়েছিলেন যে তাঁর সই এর নিচে কাগজে একটা নিশানা গভীরভাবে এঁকে দিয়েছিলেন যাতে আমি ওটা অনুভব করতে পারি।

www.amarboi.org

এটা আমাকে মনে করিয়ে দেয় যে ডা. হেইল তাঁর ব্যক্তিসত্ত্বার একটা ছাপ রাখতেন নিজের সইটি ব্রেইল হরফে খোদাই করে। আমি মার্ক টোয়েন-এর একটি কি দুটি গল্প পড়েছিলাম। তাঁর ছিল চিন্তা ভাবনা করার, বলার আর সব কিছু করার নিজস্ব পদ্ধতি। আমি তাঁর করমর্দনে তাঁর চোখের চকচকে দীপ্তি অনুভব করতে পারি। এমনকি যখন কোনো ভালোকেই স্বীকার না করার কথা এক অবর্ননীয় হাস্যকর স্বরে উচ্চারণ করেন, তখনও তিনি তোমাকে অনুভব করাবেন যে, ইলিয়ডের মতোই তাঁর হৃদয় মানবিক সহানুভূতির এক মহাকাব্য।

নিউইয়র্কে আমার একদল চিত্তাকর্ষক ব্যক্তির সাথে পরিচয় হয়েছিল। মিসেস মেরি মেপস ডজ, যিনি সেন্ট নিকোলাস পত্রিকার প্রিয় সম্পাদিকা ছিলেন আর ছিলেন 'প্যাট্‌সি'-এর মিষ্টি লেখিকা মিসেস রিগ্‌স। আমি তাঁদের কাছ থেকে পেয়েছি অনেক উপহার যেগুলোর মধ্যে মিশে আছে অমায়িক হৃদয়ের ছোঁয়া, যে বইগুলোতে আছে তাঁদের নিজস্ব চিন্তাসমূহ, আছে অন্তর আলোকিত করা চিঠিগুলো, আর আছে অনেক আলোকচিত্রও। যেগুলোর বর্ণনা আমি বারবার শুনতে ভালোবাসতাম। কিন্তু এখানে এমন স্থান নেই যেখানে আমি সমস্ত বন্ধুদের কথা উল্লেখ করতে পারি। তাছাড়া এমন অনেক জিনিস লুকোনো আছে স্বর্গবাসী জীবদের ডানার পিছনে, সেগুলো এত পবিত্র যে, প্রাণহীন ছাপার অক্ষরে তাদের প্রকাশ করা যায় না।

আমি উল্লেখ করব শুধুমাত্র আর দুজন বন্ধুর কথা। তার মধ্যে একজন পিটস্‌বার্গের মিসেস ইউলিয়াম থ। যাঁর লিন্ডহস্টে-এর বাড়িতে আমি প্রায়ই দেখা করতে গিয়েছি। দেখছি তিনি কাউকে খুশি করতে সব সময়ই কিছু না কিছু করছেন। যত দিন ধরে আমরা তাঁকে জানতাম, তাঁর ঔদার্য এবং বিচক্ষণ পরামর্শ থেকে আমার শিক্ষিকা আর আমি বঞ্চিত হইনি কখনও।

আমার অন্য একজন বন্ধুর কাছেও আমি গভীরভাবে ঋণী। তিনি সুপরিচিত দক্ষ হাতের জন্য যার সাহায্যে তিনি পরিচালনা করেন বিশাল শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং তাঁর আশ্চর্য কর্মদক্ষতা তাঁকে এনে দিয়েছে সকলের শ্রদ্ধা। সকলের প্রতি সহৃদয় এই মানুষটি কল্যাণমূলক কাজ করে চলেছেন নীরবে লোকচক্ষুর অন্তরালে। আমি আবার এমন সম্মানীয় ব্যক্তিদলের নাম স্পর্শ করেছি যাঁদের নাম উল্লেখ করা উচিত হবে না। কিন্তু আমি তাঁর ঔদার্য এবং স্নেহপূর্ণ আগ্রহের কথা উল্লেখ করতে বাধ্য কারণ তা আমাকে কলেজে যেতে সাহায্য করেছে।

এইভাবে আমার বন্ধুরাই আমার জীবন কাহিনী তৈরি করেছে। হাজারোভাবে তাঁরা আমার সীমাবদ্ধতাগুলোকে পরিবর্তিত করেছে সুন্দর সৌভাগ্যে। আমাকে অচঞ্চল ও সুখীভাবে হাঁটতে সমর্থ করেছে সেই বঞ্চনার ছায়ার আঁধারে, যা আমার জীবনে আপতিত হয়েছে।

www.amarboi.org

সাত বছর বয়সে
হেলেন কেলার

গ্রেগরি বার্নাড'শ ও লেডি এসটরের সাথে মিস কেলার, ১৯৩২

শিক্ষিকা মিস সুলিভানের সাথে

হেলেন কেলারের কোলে
তাঁর প্রিয় কুকুর, ১৮৮৭

বই ছিল হেলেন
কেলারের
নিত্য সঙ্গী

গাছের সাথে কথা বলছে হেলেন কেলার

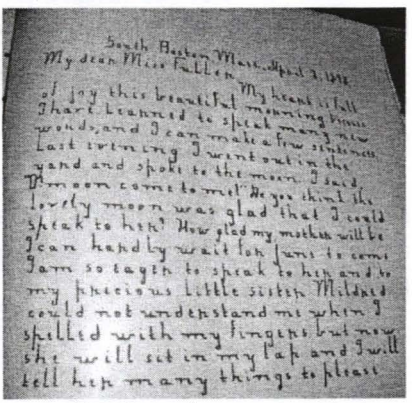

শিক্ষিকা সুলিভানের সাথে

হেলেন কেলার

হেলেন কেলারের হাতের লেখা

www.amarboi.org

দৃঢ় সংকল্পের প্রতীকের নাম হেলেন কেলার। তাঁর দৃঢ় সংকল্পের জন্য তিনি অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। অন্ধ ও বধিররা সাধারণত যে সাফল্য-চূড়া স্পর্শ করতে পারে না সেই দুরধিগম্য সাফল্য-চূড়ায় আরোহন করেছিলেন তিনি। বিশ্বজুড়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। অথচ জন্মের উনিশ মাস বয়সে অসুস্থতার কারণে হেলেন তাঁর দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি হারিয়েছিলেন। হারিয়েছিলেন তার বাক্‌শক্তিও।

এর পাঁচ বছর পর তাঁর জীবনে এলেন অ্যানে সুলিভান। শিক্ষিকা সুলিভানের আগমনে নতুন উষার আলোকে জেগে উঠল হেলেনের জীবন। অনেক সংগ্রামের পর হতাশার উপত্যকা থেকে বেরিয়ে এসে হেলেন কেলার পা রাখলেন আশার ভুবনে। ব্রেইল পদ্ধতিতে লিখতে পড়তে শিখলেন তিনি।

তিনি সবসময় মানুষের কথা বলেছেন। মানুষের অধিকার ও নারী জাগরণের পক্ষে তার কণ্ঠ ছিল সোচ্চার। তাঁর 'দ্য ফ্রস্ট কিং' (১৮৯১), 'দ্য স্টোরি অব মাই লাইফ' (১৯০৩), 'দ্য ওর্য়াল্ড আই লিভ ইন' (১৯০৮), 'আউট অব দ্য ডার্ক' (১৯১৩) প্রকাশিত হওয়ার পর চারদিকে সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর সাহিত্যকর্মের রসদ নিয়ে তৈরি হয়েছে সিনেমা ও টিভি সিরিয়াল। অতি সম্প্রতি বলিউডের উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র 'ব্ল্যাক' নির্মিত হয়েছে হেলেন কেলারের জীবনকে ঘিরেই। সম্মাননাও কুড়িয়েছেন অনেক। হেলেন কেলার অনেক ভাষা জানতেন। শুধু ইংরেজিই নয় জানতেন ফ্রেঞ্চ, জার্মান, গ্রীক এবং ল্যাটিন ভাষা। হেলেন কেলার বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। আছেন আমাদের হৃদয়েও।

হেলেন কেলারের জন্ম ১৮৮০ সালের ২৭ জুন দক্ষিণ এ্যালবামার একটি ছোট্ট শহরে তাসকাম্বিয়ায়। মৃত্যু ১৯৬৮ সালের ১ জুন আরকান রাইডের ছোট শহর ওয়েস্টপোর্ট-এর কানেকটিকাটে। পিতা : ক্যাপটেন আর্থার এইচ. কেলার, মাতা : কেট অ্যাডামস কেলার।

ISBN : 984-300-000488-0